

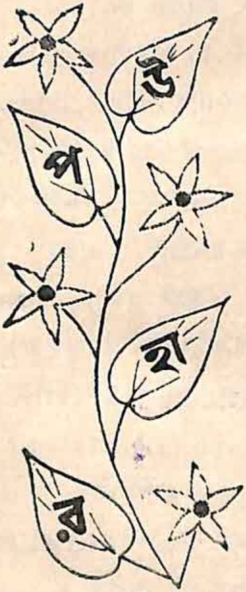
BHAKTA RUHIDAS
CODE NO. 84 B 24

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৭
৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৪·০০


উ
প
হা
র

ভক্ত রুইদাস

১

রামানন্দ স্বামীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ভগবানের ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করবার জন্য প্রতিদিন ভিক্ষা করে বেড়াতেন। একদিন টহলে গিয়ে তিনি এক বণিকের বাড়ি পৌঁছলেন। বণিক্ সৈনিকদের রসদ বিক্রি করে খেতেন। ব্রহ্মচারী এই বণিকের গৃহ হতে ভিক্ষালব্ধ ভোগসামগ্রী এনে গুরু রামানন্দের হাতে তুলে দেন।

ভোগ নিবেদনের সময় রামানন্দ স্বামী ভগবানের সাক্ষাৎ পেলেন না···রোজের মতো ঠাকুর আজ স্বয়ং এসে আহার করলেন না। রামানন্দের মনে হতে লাগলো—নিশ্চয়ই ভোগের কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে—নিশ্চয়ই এমন কিছু অনাচার ঘটেছে যাতে ঠাকুর আজ অন্নভোগ গ্রহণ করলেন না।

ব্রহ্মচারীকে ডেকে রামানন্দ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথা থেকে আজ ভোগসামগ্রী ভিক্ষা করেছো?

ব্রহ্মচারী সত্যবাদী। যা সত্য ঘটনা তাই তিনি গুরুর কাছে অকপটে বললেন।···

রামানন্দ স্বামী সব শুনে আক্ষেপ করে বলে ওঠেন—হা চামার!···

গুরুর বাক্য লঙ্ঘন হবার নয়। ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করে চামারের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। ইনিই হলেন "রুইদাস"।

শোনা যায়, রুইদাস ছিলেন জাতিস্মর। পূর্বজন্মের সমস্ত ইতিবৃত্ত তাঁর স্মরণে ছিল। তাই জন্ম নিয়েই শিশু রুইদাস পূর্বজন্মের গুরু-অভিসম্পাত স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন।···ছেলের কান্না আর থামে না। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়—শিশু রুইদাসের কান্নাও যেমন থামে না, মুখেও কিছু রোচে না। সবাই ভেবে নেন যে ছেলেকে পুঁয়ে বা পেঁচোয় পেয়েছে।

ছেলের এ অবস্থা—এ কান্না দেখে রুইদাসের বাবা-মা রুইদাসের জীবন-আশঙ্কায় ভয়ানক চিন্তিত হলেন। তাঁরা রুইদাসকে নিয়ে রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হন···তাঁকে রামানন্দ স্বামীর সামনে রেখে জন্ম অবধি এই কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

কিন্তু যে-মুহূর্তে শিশু রুইদাস রামানন্দের সামনে উপস্থিত হলেন, অমনি তাঁর কান্নাও থেমে গেল। শিশু রুইদাস যেন আনন্দে নেচে উঠলেন গুরুকে সামনে দেখে। হঠাৎ শিশু-জাতিস্মরের মুখে বাক্-শক্তি এলো! গুরুর কাছে তিনি তাঁর পূর্বজন্মের ইতিহাস বলতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে রামানন্দ স্বামীর মনে পড়লো ব্রহ্মচারীর কথা। অমনি জাতি-বিচার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তিনি শিশু রুইদাসকে রামনামে দীক্ষিত করলেন। চামারের ঘরের ছেলে রুইদাস রামানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা পেলেন।—

"তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দরিদ্রের রতন যেন মিলে হারাইলে॥
দুনয়নে বহে ধারা—না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে—নারে দুঃখ নিবেদিতে॥ (ভক্তমাল)

রামানন্দ শিশুর কানে মহামন্ত্র দিলেন। মন্ত্রলাভ করে শিশু হেসে খেলা করতে শুরু করল···মায়ের স্তন-পানাদিও আরম্ভ করল! জনক-জননী নীরোগ পুত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

* * * *

শিশু রুইদাস যখন হামাগুড়ি দিয়ে অঙ্গনে খেলা করতেন, তাঁর বাবা-মা তাঁকে নানারকম খেলনা কিনে দিতেন। কিন্তু রুইদাস কোনো খেলনাই ছুঁতেন না—উপরন্তু সেগুলিকে কখনো বা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেন···নয়তো ছুড়ে নরদমায় ফেলে দিতেন।

একদিন রুইদাসের মা কাশীর এক পর্বদিনে রামসীতাজীর মাটির মূর্তি তাঁর জন্যে কিনতে চাইলেন। রুইদাসের পিতা বললেন—কেন মিথ্যে পয়সা নষ্ট করছো? কাঠের খেলনা রুইদাস আছড়ে ভাঙে—এ তো মাটির?······রুইদাসের মা কিন্তু পয়সা খরচ করে সেই মাটির রামসীতা আর হনুমানজী কিনে এনে রুইদাসের সামনে ধরে দিলেন। রুইদাস সাগ্রহে মাটির পুতুল তিনটি নিয়ে তাদের চুমু খেয়ে, বুকে জড়িয়ে কত আদরই না করতে থাকেন!···ব্যাপার দেখে রুইদাসের বাবা তো একেবারে অবাক্ হয়ে যান।

রুইদাস কখনো কোনোদিন মাটির এই রামসীতার যুগল মূর্তি বা হনুমানজীর মূর্তি ভেঙে ফেলেন নি; বরং অতি সন্তর্পণে এই মূর্তি-গুলোকে তাঁদের কুটীরের এক কোণে বসিয়ে রাখতেন!···ক্রমে রুইদাস পাঁচ-ছয় বছরের বালক হয়ে ওঠেন।······দিনের পর দিন আরো বিস্ময়ের বিষয় ঘটতে থাকে। রুইদাস পথের ধারের বনজ কুসুম তুলে

এনে এই মূর্তিগুলোকে পুজো করতেন—সাজাতেন! নিজের খাবার এনে চোখ বুজিয়ে ধ্যানে বসে তাঁর খেলার সাথী রামচন্দ্র-সীতাকে খাবার নিবেদন করতেন···নিবেদন-শেষে হাততালি দিয়ে মূর্তিগুলোকে প্রদক্ষিণ করে "সিয়ারাম" "সিয়ারাম" বলে নাচতেন!···যে দেখতো, সে-ই অবাক্ হতো! বালকের এই সরল ভক্তি দেখে পড়শীদের ডেকে এনে রুইদাসের মা এই দৃশ্য সবাইকে দেখাতেন।

রুইদাসের বয়স এখন সাত বছর। তাঁদের বস্তির ওপারে বড় খোলা মাঠটায় হচ্ছে "রামলীলা যাত্রাগান"। রুইদাস মার হাত ধরে গিয়ে দাঁড়ান ভিড়ের মাঝে। কখন কোন্ ফাঁকে মার হাত ছাড়িয়ে রুইদাস এগিয়ে যান ভিড় ঠেলে আসরের কাছটিতে।···

দশরথের মৃত্যুতে, সীতারামের বনবাসে রুইদাসের চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। "ভরত-মিলাপে" রুইদাস আনন্দে নেচে ওঠেন! গুহক চণ্ডালের ভক্তিপ্রেমে রুইদাস জোড়হাত করে প্রণাম জানান চণ্ডালের পায়! তারপর রামসীতার চিত্রকূট-বাস, সোনার হরিণ বধ, সীতা-হরণে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে আসরে গড়াগড়ি দেন।

সবাই বালকের ভাব দেখে অবাক্ হয়ে যায়! রুইদাসের মা রুইদাসকে প্রথমটায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না; তারপর আসরের পাশে একটি বালককে নিয়ে সবাই ব্যস্ত দেখে সেখানে ছুটে যান···দেখেন, তাঁর রুইদাস আকুলভাবে কাঁদছেন আর গড়াগড়ি খাচ্ছেন।···কোলে তুলে নেন রুইদাসকে, শান্ত হন না রুইদাস!···ক্রমে জটায়ুর

উপাখ্যান, রামের সীতা-অন্বেষণেও তিনি আত্মহারা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

দর্শকেরা সবাই রামলীলা যাত্রা দেখা ছেড়ে চেয়ে থাকে এই সাত বছরের ছেলের কীর্তির দিকে !···

শবরী প্রতীক্ষায়···রুইদাস ধ্যানস্থ হন ! যাত্রার রামগানের সঙ্গে তিনিও গেয়ে ওঠেন রামনাম গান !···শবরী রামচন্দ্রকে এঁটো বুনো কুল খাওয়ায়···রুইদাস ভাবেন, এবার থেকে দেবতাকে তিনি চেখে চেখে খাওয়াবেন মিষ্টি ফল শবরীর মতোই !···

এমনি করে কেটে যায় সারাটা রাত। চোখে ঘুম নেই···ঠায় সোজা হয়ে বসে থাকেন রুইদাস। ক্লান্তি নেই—নেই অবসাদ !···

সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ অধ্যায়···রুইদাস হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। তারপর ভেঙে যায় রামলীলা গান। সবাই ফিরে যায় ঘরে। রুইদাসের মা ছেলেকে আর বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না—কিছুতেই তাঁর কান্না থামে না। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে, অনেক ভুলিয়ে বলেন—রামসীতা কি তুজন তুজনকে ছাড়তে পারে রে বেটা ! দেখিস নি তোর রামসীতার মূর্তি ? তাঁরা তুজন কেমন জোড়া হয়ে—"সীতারাম" হয়ে বসে আছেন !···

এইভাবে ভুলিয়ে রুইদাসকে বাড়ি নিয়ে আসেন রুইদাসের মা। কিন্তু এর পর রুইদাস প্রায় সাত-আট দিন ভালো করে কারো সঙ্গে কথা বলেন নি···ভালো করে খান নি···সর্বদা যেন কী এক গভীর ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন···আর মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তো !

ছেলের এই ভাবুকতা দেখে চামার জাতের সবাই ভাবতে শুরু করে দেয় যে, রুইদাসের মাথার গোলমাল শুরু হয়েছে। সেইজন্যেই সবাই ওর বাপের কাছে গিয়ে ছেলের পাগলামোর চিকিৎসা করাবার জন্য বৈদ্য দেখাতে পরামর্শ দেয়।...

রুইদাসকে কেবল বুঝেছিলেন তাঁর মা। তাই রুইদাসের পাগল আখ্যায় তিনি ঘোরতর আপত্তি জানান।

পূর্বজন্মে রুইদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন—জাতিস্মর হিসাবে তাঁর একথা বেশ মনে আছে। সাত বছর বয়সে তাঁর মা-বাবা তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাথা কামিয়ে শিখা রাখিয়ে চূড়াকরণ সমাপন করেন। মাথা কি কারণে কামানো হয়েছিল তা তিনি জানেন নি। কিন্তু তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতিতে তিনি বুঝেছিলেন যে, এ তাঁর চূড়াকরণ-সংস্কার।··· দশবিধ সংস্কারের সব কটি যে তাঁকে করতে হবে, তা তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতিতে সম্পূর্ণ মনে আছে। তাই অষ্টম বর্ষে প'ড়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে —তাঁর যখন আট বছর বয়েস তখন মা-বাবা তাঁর উপনয়ন-সংস্কার সম্পূর্ণ করছেন না কেন? তিনি ব্রাহ্মণ—গতজন্মে ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তিনি জানেন, উপনয়ন না হলে তাঁর শাস্ত্রে অধিকার হবে না··· বেদ-পাঠ, মন্ত্রজপ সবই রয়ে যাবে অসমাপ্ত···উপনয়নভ্রষ্ট হলে সাধু-সমাজে তিনি নিন্দনীয় হবেন···অথচ তাঁর বাবা-মা সেজন্য কোনই প্রচেষ্টার চিহ্ন দেখাচ্ছেন না।···

অনেক ভেবে তিনি একদিন তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবাজান! আমার উপনয়নের ব্যবস্থা কচ্ছেন না কেন? উপনয়নের অধিকারী হয়েও যদি উপনয়নভ্রষ্ট হওয়া যায়, তাহলে মহাপাতক হবে। উপনয়ন বিনা বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রদীক্ষা সবই বাকী থেকে যাবে···মৃত্যুর পর আত্মার গতি হবে না যে!

ছেলের মুখে এ-সমস্ত কথা শুনে রুইদাসের বাবা হকচকিয়ে যান। ছেলেকে কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না। অনেকক্ষণ ছেলের মুখের

পানে চেয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন—এসব কথা তুমি জানলে কি করে ?···

রুইদাস তখন উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেবের লেখা কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান ।······

আট বছরের ছেলের মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মতো শ্লোকের পর শ্লোক উচ্চারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান রুইদাসের বাবা। রুইদাস বলেন—জানো বাবা, উপনয়নে মানুষের জন্মগত অধিকার···এর কোনো জাতিভেদ নেই। এ সংস্কারের উপযোগী হয়েও কেউ যদি এ সংস্কার না করে, তার অনন্ত নরকবাস···তার সারা পিতৃকুল মাতৃকুলও তৃপ্ত হন না।

এর কি জবাব দেবেন রুইদাসের বাবা! তাঁরা যে জাতিতে চামার—চামড়ার কাজ করেই যে তাঁদের জীবিকা-নির্বাহ! মুচি হয়ে যজ্ঞোপবীত কি করে ধারণ করাবেন রুইদাসকে···অথচ ছেলেকে শাস্ত্রমতো বোঝাবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। তাই তিনি রুইদাসের মার কাছে অদ্যোপান্ত সব জানালেন। রুইদাসের মা বললেন—এস এক কাজ করা যাক! রুইদাসকে আবার নিয়ে চলো সেই সাধু রামানন্দজীর আশ্রমে।

রামানন্দের আশ্রমে রুইদাসকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর বাবা আর মা। রামানন্দ স্বামী ব্রহ্মচারী-শিষ্য রুইদাসকে দেখে জিজ্ঞেস করেন—কি ব্যাপার ?···

রুইদাস নিজেই বলেন—আমি জানি, আমি ব্রাহ্মণ ; কিন্তু বাবা-মা আমার উপনয়ন করাতে নিশ্চেষ্ট। এইজন্য আমি বাবা-মাকে অনুরোধ করছি আমার উপনয়ন করাতে।

রামানন্দ স্বামী নিমেষে বুঝে নেন সব ব্যাপারটা। চামারের ঘরে উপনয়ন-সংস্কার অনুষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণ-সমাজে যে কী ভীষণ



রামানন্দ স্বামী বলেন,—তোমার দেহের মধ্যেই যজ্ঞোপবীত নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে রুইদাস, বাইরের যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন নাই। [পৃঃ ১০

আলোড়ন ঘটবে তাও তিনি চোখের সামনে দেখতে পান। কাজেই তিনি একটু চিন্তা করে বলেন—রুইদাস! জন্মান্তর মাত্র মানুষের

কলেবর বদলানো। তুমি তো আমার সেই ব্রহ্মচারী শিষ্য! তোমার সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রথম সোপানে ব্রহ্মচারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো তুমি তোমার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেছিলে! তবে আজ আর তা তুমি খোঁজ কেন? জানো না কি, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর যজ্ঞোপবীত দেহের মধ্যে নিবিষ্ট থাকে···তাই তো সে বাইরের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে। তোমার দেহের মধ্যেই তোমার যজ্ঞোপবীত নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে, তাই তোমার বাইরের যজ্ঞোপবীত না হওয়াই উচিত। তোমার বাবা-মা ভুলক্রমে যদি তোমায় যজ্ঞোপবীত দিতেন তা হলেই তুমি ব্রহ্মচারীর ধর্ম থেকে নীচে নেমে যেতে।···

গুরুজীর কথা শুনে রুইদাসের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আট বছরের রুইদাস মনে মনে গুরুজীকে স্মরণ করে ঘরে ফিরে আসেন। আর উপনয়ন-সংস্কারের বায়না ধরেন না।

* * * *

রুইদাস দ্বাদশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছেন···রাস্তায় বেরুতে শিখেছেন··· কাশীর সমস্ত রাস্তাঘাট তাঁর আজ নখদর্পণে। তাই সকালে উঠে মাকে প্রণাম জানিয়ে খেলতে বেরোন রাস্তায়। খেলা তাঁর স্বামী রামানন্দের আশ্রমে। সে আশ্রমে যত লোক আসেন রামানন্দের সাক্ষাৎ আশে, রুইদাস তাঁদের জুতা-খড়ম পাহারায় থাকেন। তাঁদের ফেরার পথে নিজ হাতে জল দিয়ে ধুইয়ে দেন তাঁদের পা···পরিয়ে দেন তাঁদের পাদুকা তাঁদের পায়ে।

এই খেলা সকাল-সন্ধ্যা। আর দূরে দাঁড়িয়ে আশ্রমের "রামনাম কীর্তনের" সঙ্গে কীর্তন গাওয়া।···

রুইদাসের বাপ রুইদাসের মাকে ডেকে বলেন—ছেলে এবার বড় হয়েছে, কিছু কাজকর্ম শিখুক, নইলে বড় হলে সংসার নির্বাহ করবে কি করে ?

রুইদাসের মা ছেলের ভগবদ্‌ভক্তি দেখে মনে মনে ভয় পেতেন—পাছে ছেলে বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করে !……তাই তিনিও বুঝেছিলেন, রুইদাসের কাজ শেখা একান্ত দরকার—কাজ-কর্মে মন থাকলে ছেলে কোনদিনই সন্ন্যাসী হবে না। কিন্তু রুইদাসের মতো ছেলেকে সংসারের কাজ-কর্মের দিকে টেনে আনা তো সহজ কথা নয় ! তাই রুইদাসের মা তাঁর বাবাকে বলেন—দেখ, ওর কাজ শেখার জন্যে আমি এক ফন্দি বার করেছি। তা যদি করো তাহলে রুইদাসকে কাজ শিখতেই হবে।…

—কি ফন্দি ?

—ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলেই ও সংসারী হবে। সংসারী হলেই কাজকর্ম শিখতে হবে…আর কাজকর্ম শিখলেই সংসার চালাতে সমর্থ হবে।

—যুক্তিটি মন্দ নয়…তবে !…

—তবে কি গো ?—রুইদাসের মা বলেন।

রুইদাসের বাবা উত্তর দেন—যদি ধর বিয়ের পর সংসার না করে হঠাৎ বাড়ি থেকে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় !

রুইদাসের মা ভেবে বলেন—আমার মনে হয় রুইদাস ওর গুরুজীকে ছেড়ে বারাণসী থেকে কোথাও যাবে না।

রুইদাসের পিতা বলেন—বেশ, তবে সাধুজীর সঙ্গে কথা কয়ে

ওর একটি বিয়ে দিয়ে দেই। সাধুজী বললে রুইদাস আর না করতে পারবে না।

রুইদাস আর তাঁর মা-বাপ গিয়ে রামানন্দের আশ্রমে হাজির হন। রামানন্দ বলেন—রুইদাস! সংসার-আশ্রমের চেয়ে আর বড় আশ্রম কোথাও নেই। বাবা, মা, স্ত্রী নিয়ে যোগী হওয়া যোগাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম! তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে···তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুগ্ধ···তোমার বৈষ্ণব-বিনয়ে আমি সন্তুষ্ট···তুমি গৃহাশ্রম গ্রহণ কর। বাবা-মার মনে কষ্ট দিও না···তুমি বিবাহ কর।

গত জন্মে গুরুর "হা চামার" কথাও বোধ হয় রুইদাসের মনে এত বড় ধাক্কা দেয় নি!···কিন্তু আজ?···আজ গুরুজী তাঁকে এ কী অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলেছেন!···

রুইদাস অনেক ভেবে ধীরে ধীরে বলেন—গুরুজী, সংসারের সেবা করতে গিয়ে বৈষ্ণব-সেবা যে ব্যাহত হবে!···

রামানন্দ স্বামী বলেন—না রুইদাস, সেবা তুজনেরই করবে। স্বোপার্জিত অর্থের অর্ধেক দিয়ে সংসারের সেবা করবে, আর বাকী অর্ধেক হবে বৈষ্ণব-সেবা।

রুইদাসের বাপ-মা এ-কথা মাথা পেতে মেনে নেন। রামানন্দ স্বামীর কাছে তাঁরা কথা দেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা রুইদাসকে জুলুম করবেন না।···

যথাসময়ে রুইদাসের বিবাহ সম্পন্ন হলো। ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কারের আরও এক সংস্কার রুইদাসের জীবনে পূর্ণ হলো।···

রুইদাস বাপের কাছে চামড়ার কাজ শিখেছিলেন। ছোট্ট একটি

ঘরে বসে তিনি দুলে দুলে গান গেয়ে জুতো তৈরি করতেন।···মাত্র দুজোড়া পাদুকা! একজোড়ার আয় নিজের স্ত্রীর ও বাবা-মার ভরণপোষণে ব্যয়িত হতো, আর অপর জোড়ার আয় দিয়ে সন্ধ্যায় ও সকালে বৈষ্ণব-সেবা চলতো। জুতো সেলাই করতে করতে তাঁকে যে গান গাইতে শোনা যেতো সে গানখানি বড় মধুর—

রাম ভগত কো জন ন কহাউঁ—সেবা করুঁ ন দাসা।
জোগ জজ্ঞ গুণ কছু ন জানুঁ—সাতে রহুঁ উদাসা॥
ভগত হুয়া তো চড়ে বড়াই···জোগ করুঁ জগ মানৈ।
গুন হুয়া তো গুণীজন কহৈ···গুণী আপকো আনৈ॥
ন ম্যায় মমতা মোহ ন মোহিয়া···ইয়ে সব জাহিঁ বিলাই।
দোজখ বেহেস্ত দো সমকর্ জানি···দুহুঁতে তরক্ যায় ভাই॥
মায়া অরু মমতা দেখি সকালজগ্···মায়া সে ভূল গঁওয়াই।
জব মন মমতা এক একমন···তববি এক হ্যায় ভাই॥
কৃষ্ণ-করিম-রাম-হরি-রাঘব···জব নগ এক ন পেখা।
বেদ-কতেব-কুরান-পুরানন···সহজ এক নহিঁ দেখা॥
জোই জোই পুজিয় সোই সোই কাঁচো···সহজ ভাব সত হোই।
কই রুইদাস ম্যার পহিকো পুজুঁ···জাকে ঠাও—নাও নাহি হোই॥

৩

রুইদাসের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স মাত্র আট বছর, আর রুইদাস ছিলেন বারো বছরের। ছোটবেলায় বিয়ে হলে চামারদের স্ত্রীরা বাপের ঘরেই থাকে, তবে বয়ো-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসে শ্বশুরঘর করতে—স্বামীর ঘর করতে। সেই সময় রীতি-অনুযায়ী নানারকম স্ত্রী-আচারাদি হয়ে থাকে···আর হয় পুরুষ-সমাজে ভোজের আয়োজন।

আজ রুইদাস পূর্ণ-যৌবন-সম্পন্ন। তাই স্ত্রী এসেছে পুনরায় তার শ্বশুরবাড়ি। রুইদাসের বাপ তাই খরচা করে একটি ভোজের আয়োজন করেছেন! চামারদের ভোজে সুরা এবং মাংস একটি বিশেষ অঙ্গ। কাজেই রুইদাসের পিতা সেই রকমই আয়োজন করবেন স্থির করেছেন। কিন্তু রুইদাস প্রতিবাদ জানালেন···তাড়ি, মদ ইত্যাদি বর্জন করে দুধ দই ক্ষীরের আয়োজন করতে বললেন। রুইদাসের ইচ্ছা-অনুযায়ী নিমন্ত্রিতের জন্যে এই আয়োজনই হলো।

যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এলেন। যথারীতি ভোজের আয়োজন-স্থানে সবাইকে উপস্থিত করা হলো। এক সর্দার তো এই আয়োজনে খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন···খাওয়া ছেড়ে বললেন—চামার-সমাজের রীতিই হচ্ছে আজকের দিনে মদ্যপান ও মাংসাহার। রুইদাস সমাজ-বিগর্হিত কাজ করেছে।

সবারই মন উসখুস করছিল। সর্দারের কথার সুযোগ নিয়ে সবাই উঠে দাঁড়াল। রুইদাসের বাবা বড় মুশকিলে পড়ে গেলেন। সবাই যদি

নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে আজ অভুক্ত অবস্থায় তাঁর বাড়ি থেকে চলে যায়, তবে তিনি সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে !···তাই তিনি বলে ওঠেন—দাঁড়ান···দাঁড়ান।···আপনারা রাগ করবেন না—

সবাই উত্তর দেয়—না-না-না !

জোড়হাত করে রুইদাসের বাপ বলেন—আজকের মতো ক্ষমা করে খেয়ে যান সব···এরপর কোনদিন আর এমন হবে না।

রুইদাসের শ্বশুরপক্ষ প্রাচীন প্রথার পক্ষে !···বড় কুটুম্ব বলে—এ শুধু অসামাজিক নয়···এ ব্যবস্থা তাদের নিমন্ত্রিত করে অপমান করার উদ্দেশেই করা হয়েছে।

খাওয়ার আসন ত্যাগ করে সব বাইরে এসে হাজির হলো। বহু তর্ক-বিতর্কের পর রুইদাসের বাবার বিনীত নিবেদনে সবাই একটি পঞ্চায়েতে বসতে রাজী হলো। পঞ্চায়েতের বিচারেই এই সমস্যার সমাধান হবে।···

পঞ্চায়েত-মণ্ডলীর মাঝে রুইদাসের শ্বশুর প্রথম কথা বললেন—

"মাস্‌হারী বিন্ মাংসকে ভোজনকো ক্যায়সে খায়ে গা ?

বিন্ মদিরাকে কহো আত্মা ক্যায়সে তৃপ্তি পায়ে গা ?

অর্থাৎ—মাংস-আহারী মাংস ছাড়া কেমন করে খেতে পারে ? মদ-পিয়াসীর আত্মা বিনা মদে কেমন করে তৃপ্তি পাবে ?

রুইদাস জোড়হাতে দাঁড়িয়ে উত্তর দেন—

"হরেক ভোজমে হর্ জায়গাহে, হম্ হর্ হনেশ জাতে থে।

মাংস মদিরাকা নাম নহী থা···সব-দুগ্ধ ঘৃত খাতে থে॥

দধি সোহারী ব্যঞ্জনাদি সব···হর জগহে আতে থে।
ইচ্ছা ভর ভোজন কর পঞ্চো···সব হী লৌট আতে থে॥”

কাজেই আপনারা বলুন—এই যদি আমাদের সামাজিক প্রথা, তবে এ প্রথার প্রচলন কত দিন থেকে হয়েছে? আমি পঞ্চায়েতের সভ্যদের এইটুকুই জিজ্ঞেস করতে চাই!

সবাই চুপ করে থাকে রুইদাসের প্রশ্নে!

রুইদাস বলেন—চুপ করে রইলেন কেন? আপনারা সব বয়োবৃদ্ধ ···কেউ কেউ এখানে অশীতিপর বৃদ্ধও রয়েছেন, বলুন আমাকে, কবে থেকে এ প্রথার প্রচলন হয়েছে?

সবাই আবার নিরুত্তর···

রুইদাস বিনীত কণ্ঠে বলেন—মন দিয়ে আপনারা শুনুন। আপনারা সবাই আমার পিতার সমান। এ রীতি, এ নীতি আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে—হিন্দু-সমাজে কোনদিনই প্রচলিত ছিল না। যেদিন হিন্দুস্থান পররাজ্যের কবলিত হলো, সেই দিন থেকে সে-রাজ্যের লোকেরা এসে আমাদের শুদ্ধ শুচি সমাজে এ প্রথার প্রচলন করেছে। অনেক ভোজনে আমিও ছেলেবেলা থেকে গেছি, বহু জাতের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি, কিন্তু এ প্রথার প্রচলন দেখি নি। তাছাড়া মাংস-মদ খাওয়া তো রাক্ষস-প্রথা! আর্যেরা এ দুটো জিনিস কোনদিনই ছুঁতেন না। আজ আমরা কর্মগতিকে চামড়ার কাজ করি বলে রাক্ষস-প্রথার অনুগামী হব কেন?··আপনারাই বলুন—আমাদের নীচ

বর্বর বন্য রাক্ষস বলে কেউ যদি ডাকে, তা কি আমাদের গালাগাল-স্বরূপ মনে হবে না ?···

ধর্মশাস্ত্রকার শ্রীমৎ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—সুরাপায়ীর আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। উষ্ণ ঘৃত, উষ্ণ গোমূত্র ইত্যাদি পান করে মরণই হচ্ছে এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। মনু বলেছেন—যে-ব্যক্তি সুরাপান করে তাকে সাজা দিতে গিয়ে রাজা যেন তার কপালে সুরাধ্বজ-চিহ্ন এঁকে ছেড়ে দেন, যাতে সমাজের লোক তার কপালের এই চিহ্ন দেখে তাকে বর্জন করে।···

সবাই চুপ করে থাকে। কিন্তু রুইদাসের শ্বশুর উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেন—বাবাজী। যা-যা বলছো, তা সবই ঠিক। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস ; আজ হঠাৎ সে-অভ্যাস এক মুহূর্তে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই যখন কুটুম্বাদি সবাই মনঃক্ষুণ্ণ, তখন কিছু মদ ও মাংস ব্যবহারের ব্যবস্থা করলে তারা সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরে যেতে পারবে···আর বাকী যারা এ জিনিস না খেয়ে দধি দুগ্ধ ক্ষীর খেতে চায়, তারা তাই খেয়ে যাবে।···আশা করি বাবাজী বোধ হয় এ-ব্যবস্থায় বাধা দেবে না ?···

রুইদাস গুরুজনদের কখনও আঘাত করেন না ! তার উপর শ্বশুর পিতা সবাই যখন এতই পীড়াপীড়ি করছেন, তখন ভগবান্ রামচন্দ্রকে স্মরণ করে বলেন—বেশ, সর্দার নিজে গিয়ে ওই চামড়ার মশক ভরে এক মশক মদ্য-তাড়ি আনুন···আর আমার বড় কুটুম্ব নিজ হাতে মাংস কেটে রন্ধনের ব্যবস্থা করুন !

সবাই আনন্দে রুইদাসের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সবারই জিব দিয়ে জল ঝরে···সবাই মনে মনে ভাবে—কে আর দুধ দই ক্ষীর

খাবে বাবা ! তার চেয়ে যখন ব্যবস্থাটা হয়েই গেল তখন একটু অপেক্ষা করা যাক···

* * *

মাংস আর মদের লোভে সবাই অপেক্ষায় আছে। সভার মাঝে নানা রঙ্গের আলোচনা চলেছে। কিন্তু রুইদাস সবার অলক্ষ্যে নিজের ছোট্ট চামড়ার ঘরটিতে বসে সজল চোখে গাইতে থাকেন—

কেশবে ! বিকট মায়া তোর, তাতে বিকল গতি মতি মোর।
সুবিষংগ সন্ করাল-অহিমুখ গ্রাসতি সুটল সুভেষ—
নিরখি মাখী বকৈ ব্যাকুল লোভ কালর দেখ্ ॥
ইন্দ্রিয়াদিক দুঃখ দারুণ অসংখ্যাদিক পাপ···
তোহি ভজন রঘুনাথ অন্তর, তাহি ত্রাস ন তাপ ॥
প্রতিজ্ঞা প্রতিপাল···প্রতিজ্ঞা চিহ্ন···জুগ ভগতি পুরণ কাম।
আস্ তোরা ভরোসা···রুইদাস "জয়জয়-রাম"।

অর্থাৎ—হে কেশব ! বিকট তোর মায়া, আর বিকল আমাদের মতিগতি। কালরূপ সাপ আজ যত কিছু ভালো গ্রাস করতে বসেছে। কালের লোভ দেখে আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি। ইন্দ্রিয়াদির দুঃখ দারুণ এবং পাপ সংখ্যাতীত।···হে রঘুনাথ, তোমাকে অন্তরে ভজনা করছি, তুমি নিজে এসে তাপ নষ্ট কর !···তোমারই উপর এখন একমাত্র ভরসা···তুমি সেটুকু রাখলে রুইদাস 'জয়-জয়-রাম' বলতে পারে।

* * *

ভোজনের আয়োজন সম্পূর্ণ। সবাই আসনে বসেছে। রুইদাস এসে জোড়হাতে দাঁড়ালেন। চেয়ে দেখলেন—একজন নিমন্ত্রিতও

নিরামিষ আসনে উপবিষ্ট নয়। সবাই আজ বসেছে একই পংক্তিতে মাংস-আর মদের লোভে…

সবার সামনে দাঁড়িয়ে রুইদাস বলেন—হে অতিথিবৃন্দ ! আশা করি এবার আপনাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে।…শুধু আমার দুইটি



সবাই মুখ-চাওয়াচায়ি করে,—মদ কোথায়, এ যে দধির ঘোল ! [পৃঃ—২০

অনুরোধ আছে—একটি এই যে, সর্দারজী ও আমার বড় কুটুম্ব নিজ হাতে মদ ও মাংস পরিবেশন করবেন ; আর অপরটি এই যে, আপনারা খাবার আগে একবারটি সমস্বরে আমার সঙ্গে বলুন—"জয়-জয়-রাম !"

সবাই সমস্বরে তিনবার জয়-জয়-রাম ধ্বনি করে আহারে প্রবৃত্ত হলো।···

মাংস, রুটি আর তার সঙ্গে মদ্য পাতে পাতে ঢেলে দেয় স্বয়ং সর্দার আর রুইদাসের বড় কুটুম্ব! সবাই গ্রাস তুলতে যাচ্ছে···দেখে, তাদের পাতে মাংস-রুটি নেই—রয়েছে রুটি-মেঠাই···আর মদ্য-পানীয়ের বদলে সবাই পাত্রে চুমুক দিয়ে পান করছে ঘোল!

সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে! হঠাৎ রুইদাসের শ্বশুর বলেন—এ কি! মাংস কোথায়, এ যে মেঠাই! মদ কোথায়, এ যে দধির ঘোল!

সর্দার নিজের জিম্মায় মদ রেখেছে···দৌড়ে গিয়ে মশক থেকে নিজে হাতে মদ ঢেলে আনে···কিন্তু পাতে দিতে গিয়ে দেখে—ঢালছে ঘোল! রুইদাসের বড় কুটুম্ব ভাল ভাল মাংস হাতায় করে তুলে নিয়ে আসে আপন হাতে···পাতে দিতে দিতেই তা হয়ে যায় মেঠাই!

হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। সবাই হতভম্ব হতবাক্···চেয়ে থাকে রুইদাসের দিকে! রুইদাস তখন উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন—

আস্ তোরা ভরোসা···র‍্যয়দাস "জয়-জয়-রাম"।

দুচোখে তাঁর ভক্তির অশ্রুধারা!···

সবাই তন্ময় হয়ে সমস্বরে বলে ওঠে—

"জয়—জয়—রাম॥"

৪

যৌবনের প্রথমেই রুইদাসের বাবার মৃত্যু হয়! সংসারে প্রবেশ করবার মুখেই এভাবে পিতৃহীন হলে অনেককেই অসুবিধায় পড়তে হয়। রুইদাসও কিছুদিন একটূ অসুবিধা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তা কাটিয়ে উঠলেন। তাঁর প্রয়োজন ছিল এতই কম যে অভাবের কোনো আশঙ্কাই তিনি করতেন না। তবু তাঁকে এক ভয়ানক দুর্বৎসরের সম্মুখীন হতে হলো।...

সারা বারাণসীতে আকাল পড়ে গেল। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার স্থানেও অন্নাভাব দেখা দিল। দুর্ভিক্ষের তাড়নে সবাই খাদ্যাভাবে ত্রস্ত হয়ে উঠলো!...

রুইদাসের চামড়ার কারবারে ঢিলে পড়লো।...লোকে অন্ন জোটাবে, না পাদুকা পরবে!...জীবনের প্রয়োজন যৎসামান্য, তবুও রুইদাস অন্ন-সংস্থানে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তার উপর সাধু, সন্ত, অতিথি সৎকারের হার দিন দিন এতো বেড়ে যেতে লাগলো যে, রুইদাস নিজে অভুক্ত থেকেও তাঁদের পরিতুষ্ট করতে সমর্থ হলেন না। রুইদাসের একমাত্র ভরসা শ্রীরামজী! তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে ভেবে রুইদাস মাঝে মাঝে নির্জলা উপবাসে থেকেও তাঁর অতিথিদের সেবা করতে থাকেন।...

একদিন নিজের কুটীরে বসে জুতো সেলাই করছিলেন—মুখে দুঃখহরণ, কষ্টহরণ শ্রীরামজীর নামগান!...এক বণিক্ এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

রুইদাস মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন—কোনো জুতা মেরামতের আবশ্যক আছে কি ?

বণিক্ বলেন—না, আমি আপনার গান শুনে এখানে দাঁড়িয়েছি। ···আমি একজন বণিক্, আমি প্রকৃত হরিভক্ত একজনকে খুঁজছিলাম। আপনার হরি-অনুরাগ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।···

রুইদাস বিনীত হাসি হেসে আবার গান ধরেন—

"এ্যাসী মেরী জাতি বিখ্যাত চামার।
হৃদয় রাম গোবিন্দ গুণসার॥
সুরসরি জল কৃত বারুণী রে—
জেহি সন্তজন নহি করত পান।
সুরা অপবিত্র তিনি গঙ্গাজল আনিয়ে,
সুরসরি মিলত নহি হোত আন।"

অর্থাৎ—আমি বিখ্যাত চামার জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছি। হয়তো হৃদয়ে রামনাম, গোবিন্দের নাম রাখা আছে! তবু জানেন তো, গঙ্গাজল দিয়ে যদি সুরা তৈরি করা যায়, সে-সুরা সাধু-সন্ন্যাসীরা পান করতে পারেন না। অথচ সুরা নিয়ে যদি জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তা গঙ্গায় মিশে গিয়ে গঙ্গাই হয়ে যায়।···

বণিক্ বলেন—আপনি চামার, সে তো চোখের সামনেই দেখছি। আপনার হাতের জল লোকে পান করতে পারে না তাও জানি। তা সত্ত্বেও আমি হরিনামে তৃষিত, আমায় আপনার হাতেই সে-জল পান করতে হবে। তাই আপনার দ্বারে আমার মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করতে চাই···

রুইদাস সাদরে তাঁর আসন ছেড়ে অতিথিকে বসান। তারপর বলেন—আপনার কি অভিলাষ বলুন ; সাধ্যাতীত না হলে তা পূরণ করবার চেষ্টা করব।

বণিক্ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের কাপড়ের বন্ধনী থেকে একটি ছোট পাথর বের করে বলেন—মহারাজ! এটি হচ্ছে পরশ-পাথর। আমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত এই পরশ-পাথরটি আপনাকে অনুগ্রহ করে নিতে হবে ; কারণ হরিভক্তকে এটি দান করবারই আজ্ঞা দিয়ে গেছেন আমার পূর্বপুরুষ।

রুইদাস স্মিত হেসে উত্তর করেন গানে—

"অনেক অধম জিব নাম গুণ উধরে,
পতিত পাবন ভয়ে পরসি সার।
ভনত রৈদাস ররংকার গুণ গাওয়তে,
সন্ত সাধু ভয়ে সহজ পার॥"

অর্থাৎ—পতিত-পাবনের নামগুণে অনেক অধমই উদ্ধার পেয়ে যায়। রুইদাস সেই সাধুসন্তের সহজ পারাবার রামনামের ঝংকার তুলে, রামগুণ গান করে চলেছে মাত্র।

রুইদাস বলেন—রামনাম-পরশপাথরে আজ যদি রুইদাস সোনা হয়ে ওঠে, তবু সে সোনায় গড়া চামার রুইদাসই থাকবে।···মহাত্মন্! তাই দিবারাত্র চেষ্টা করছি যাতে এই চামার ওই সর্বধর্ম, সর্বজাতি, সর্বসংস্কার-হীন শ্রীরাম-মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে রুইদাস চামারের আর নিজের ব্যক্তিত্ব থাকবে না—লীন হয়ে যাবে সে অতলান্ত প্রেমের পারাবারে!

বণিক্ বলেন আজ দেশে আকাল পড়েছে। সারা দেশের লোক দুর্ভিক্ষের জ্বালায় কেঁদে ফিরছে। মহাত্মন্! এই পরশ-পাথর দিয়ে বহু স্বর্ণ বিনিময়ে আপনি তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারবেন নিজের পরিবারবর্গেরও অন্নের সংস্থান হয়ে যাবে।

রুইদাস আবার হাসেন। বলেন—এত বড় সৎকাজ করলে মানুষ কত বড় নাম কামাতে পারে···স্বয়ং ভগবানের প্রতিভূ বলে নিজেকে জাহির করতে পারে! এ কি কম সৌভাগ্যের কথা।···হে বণিক্‌শ্রেষ্ঠ, এ সৌভাগ্য আপনি নিজে না নিয়ে আমার মতো অভাজন চামারের হাতে তুলে দিতে এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না! আমি অজ্ঞান, অধম···এর মধ্যে কি নিগূঢ় তথ্য নিহিত রয়েছে আমায় বুঝিয়ে বলুন।

বণিককে এই কথাগুলো বলেই রুইদাস জোড়হাতে ভগবানকে জানান—

"ইয়া রামা! এক তু-দানা—
তেরা আদিভেখ না।
তুঁ সুলতান-সুলতানা—বান্দা সকিসত্য অজানা॥"

অর্থাৎ হায় রাম! অন্নময় পৃথিবীর তুমিই একমাত্র খাবার দানা। কাজেই ভিক্ষার আদিতেও তুমি।···তুমি সুলতানের সুলতান, আমি গোলাম—নির্বল—দুর্বল—লোকের অপরিচিত!

বণিক্ যুক্তি দিয়ে কোনো উত্তরই দিতে পারেন না···খালি পরশ-পাথরখানি নেবার জন্য রুইদাসকে বার বার মিনতি জানান।

অবশেষে রুইদাস বণিকের মনে ব্যথা দেবেন না ভেবে বলেন—বেশ! আপনার যদি মনে হয় যে, এ পরশ-পাথর আমার এখানেই

থাকবে, তাহলে আপনি নিজ হাতে ওই পাথরটি আমার কুটীরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে যান।

অগত্যা বণিক্ সেই পরশপাথরখানি রুইদাসের চালের বাতায় গুঁজে রেখে নমস্কার করে চলে যান।

রুইদাস উদাস দৃষ্টিতে রামজীর মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন···তারপর গেয়ে ওঠেন—

ইয়ে তন্-হস্ত-খস্ত খরাব, খাতির অন্দেসা বিসিয়ার ॥
রৈদাস, দাসহি বোলি সাহিব—দেহু অব দিদার ॥

অর্থাৎ—আমার এই তনু-হাতটি তো সবই খারাপ—নোংরা ! তাই আপনার খাতির রাখতে অপারক হলাম।···রুইদাসকে তোমার দাস মনে করে ডেকে নাও প্রভু—আর তোমার প্রশস্ত পথ দেখিয়ে দাও !···

রুইদাস বুঝেছিলেন যে, এ শ্রীরামজীর পরীক্ষা। প্রবাদ যে, বারাণসীর এই আকাল দেখে স্বয়ং অন্নপূর্ণা শিউজীকে পাঠিয়েছিলেন রামভক্ত রুইদাসের সাহায্যার্থে এই পরশ পাথর দিয়ে। কিন্তু শ্রীরামজী ব্যতীত কোনো লোভেই রুইদাস আজ আকৃষ্ট নন !···

* * * *

তেরো মাস অতীত হয়েছে।···

মহাকাল দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছু কমে গেছে। বণিক্ এসে দাঁড়ান রুইদাসের পর্ণকুটীরের দ্বারে। রুইদাস তেমনি বসে জুতো সেলাই করছেন আর রামনাম করছেন।···

বণিক্ এসে তাঁর পরশপাথরখানির অনুসন্ধান করে দেখেন যে সেখানি ঠিক সেই রকমই রাখা আছে—তাতে রুইদাস হাতও দেননি।···

বণিক্ বলেন—রুইদাসজী! আপনি যদি পরশপাথর না নেন, আমি সঙ্গে করে ছুঘড়া মোহর এনেছি, আপনি তাই গ্রহণ করুন।...

রুইদাসজী বলেন—বার বার আপনি আমায় মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন কেন? আপনি কি সত্যই আমার সহৃদয় কল্যাণকামী, না—

এর বেশী বললে পাছে বণিক্ আঘাত পান তাই রুইদাস চুপ করে যান। কিন্তু তিনি কুটীর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে চান...

বণিক্ বলেন—এ কি, আপনি কুটীর ত্যাগ করতে যাচ্ছেন নাকি!

রুইদাস বলেন—আমার প্রাণের রামজী একদিন এই স্বর্ণ-হরিণ বিভ্রমেই তাঁর লক্ষ্মীসমান স্ত্রীকে হারিয়ে হাহাকার করে বেড়িয়েছেন! ...আমি যদি রাম ছেড়ে সোনার মায়ায় বিভ্রম নিয়ে আসি, আমিও চিরদিনের জন্য লক্ষ্মীহারা হয়ে ঘুরে বেড়াব।...আপনি কি আমাকে এই অভিশাপ কুড়াবার জন্যই স্বর্ণ দান করতে এসেছেন প্রভু!...

এরও উত্তর বণিকের কাছে ছিল না। তিনি মোহরের ঘড়া সবার অলক্ষ্যে রুইদাসের বাড়ির উঠানে রেখে চলে যান।...

বাড়ি ফিরে রুইদাস কেমন অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন...সর্ব অঙ্গ তাঁর যেন জ্বালা করতে থাকে। তিনি সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করে গায়ের জ্বালা নিবারণ করেন...তারপর আপনার জুতো সেলাই-এর ছোট কুটীরে রাত্রি যাপন করেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখেন—স্বয়ং রামজী এসে তাঁকে যেন আদেশ করছেন, বলছেন—রুইদাস! আমি তোমার হাতের নিত্যপূজা পেতে চাই তুলসী, বিল্বদলে, গঙ্গাজলে। তারই জন্যে বণিকের বেশে তোমায় দিয়ে এসেছি মোহরের ঘড়া। ও স্বর্ণ তুমি

তোমার নিজের জন্য ব্যবহার করো না। ওই অর্থ দিয়ে তুমি তৈরি কর তোমার ইষ্টদেবের শ্রীমন্দির আর অতিথির জন্য ধর্মশালা। তোমার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তুমি আমায় নিজহাতে পূজা কর, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তোমার বাড়ির উঠানের কোণে ওই মোহর সুরক্ষিত আছে।

ভোরের স্বপ্নে রুইদাসের ঘুম ভেঙে যায়। উঠে গিয়ে সত্যি সত্যি দেখেন তাঁর বাড়ির উঠানের কোণে ঘড়া ঘড়া মোহর সংরক্ষিত রয়েছে।...

সেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন ভগবানের শ্রীমন্দির। নায়ারণ-শিলা নিয়ে এসে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে নিজ হাতে নিত্য সেবা-পূজা করেন।...ধর্মশালায় সেবা শুরু হয় অতিথি, অভ্যাগত, সাধু-সন্তদের নিয়ে।...

রুইদাসের খ্যাতিতে বারাণসীর চামার, চণ্ডাল, অচ্ছুতদের মনে আর আনন্দ ধরে না! নিত্য সন্ধ্যা-সকালে রুইদাসের মন্দিরে জড়ো হয়ে তারা নাম-কীর্তনে বিভোর হতো!

৫

কাশীর ব্রাহ্মণ-সমাজ সাধু-সন্তদের ওপর ভারী চটা। কারণ সাধু-সন্তদের এতই নতুন নতুন মতবাদ যে ব্রাহ্মণত্বের লেশটুকু পর্যন্ত বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছে।...সাধুদের মধ্যে কেউ ডোম, কেউ জোলা, কেউ সুবর্ণ-বণিক, কেউ নাপিত, কেউ চামার! এ যেন এক অরাজক রাজ্য—যে যার মত নিয়ে নিজের নিজের সম্প্রদায় গড়ে তুলছে!...

রুইদাস চামার হয়ে হঠাৎ এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেই তাতে নারায়ণ-শিলা বসিয়ে নিজে হাতে তাঁর পূজা, সেবা শুরু করে দিলেন। কাশীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই দেখে যেন খেপে ওঠেন। তাঁরা সভা বসিয়ে পরস্পর পরামর্শ করে একদিন রুইদাসের মন্দিরে চড়াও হয়ে বসেন। রুইদাস করজোড়ে এসে দাঁড়ান তাদের সম্মুখে...

রুইদাসকে ডেকে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একজন জিজ্ঞাসা করেন যে, কি অধিকারে তিনি নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কি মনে করেই বা নিজ হাতে তাঁর পূজা-সেবা সমাধান করেন?...অপর একজন প্রশ্ন করেন—রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে চামার হয়ে তিলক-মালা ধারণ করেছিস? তুই কি ভেবেছিস যে কাশীর পণ্ডিত-সভা কাশী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে?...

রুইদাস শান্ত হয়ে অকপটে তাঁর স্বপ্নাদেশ সবার কাছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু সবাই উপহাস করে উত্তর দেন—বেটা চামার!

শ্রীরামজী আর সারা কাশীতে লোক খুঁজে পেলেন না, হঠাৎ চামারের ঘরে স্বপ্ন দিতে লেগে গেলেন! বেটার সব বানানো!

রুইদাস জোড়হাতে বলেন—আপনারা আমার উপর শুধু শুধু রাগ করছেন। আপনারা প্রতাপশালী, পণ্ডিত-প্রবর, ধর্মশাস্ত্র আপনাদের নখদর্পণে। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণসম। জাতিতে আমি চামার। চর্ম নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু মানুষের কর্ম ছাড়াও ধর্ম আছে। কর্ম নীচু হলেই মানুষের ধর্ম নীচু হয় না। কারণ ধর্ম—সে তো ধ্রুব-সত্য!

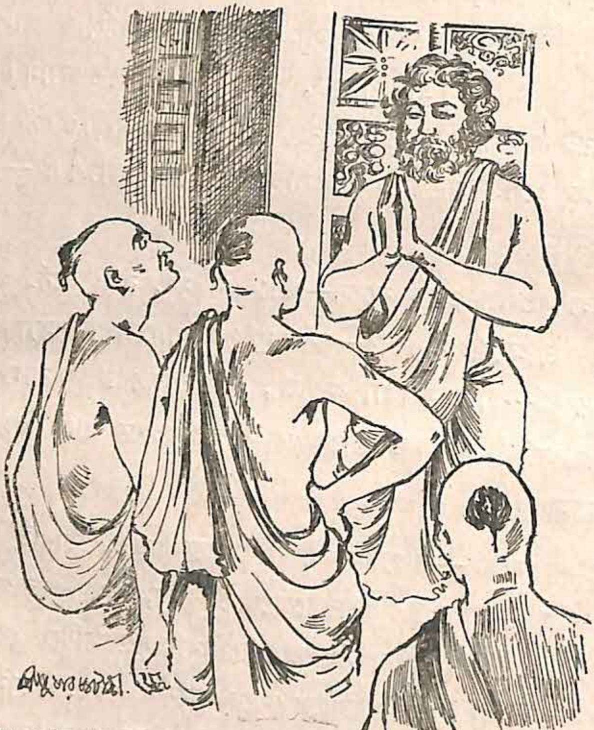
ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রধান বলেন—জানো না মূর্খ, কর্মই ধর্মের অধিকার আনে। ব্রাহ্মণের অধিকার—ধর্ম-কর্ম, পূজা-পাঠে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ব্রাহ্মণের ধর্ম···হরির সাংস্কারিক পূজা, সেও ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবতার অর্চনা হয় না, তাই তো ব্রাহ্মণ জগতে আজ শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।···

রুইদাস বলেন—ব্রাহ্মণের আসন সমাজে শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই ব্রহ্মকে জানেন বলে—নইলে দেবতার চোখে উঁচু-নীচু, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সবই সমান। অচ্ছুত করে যাদের সমাজের ত্রিসীমার দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদেরও মধ্যে যদি ব্রহ্মকে চিনতে পেরে থাকেন কেউ, তিনিও তো ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য! ভগবানের দরবারে তাই ব্রাহ্মণ-অচ্ছুতের কোনো দামই নেই···

হেসে ব্রাহ্মণেরা উত্তর দেন—নীচুজাতির, নীচুকর্মীর উঁচুধর্ম। বেশ বোঝাচ্ছ ছোকরা! তোমার এ মন্দির আজ থেকে ব্রাহ্মণের

সম্পত্তি—ব্রাহ্মণের অধিকার। নারায়ণ-শিলার সেবায়তই এই মন্দিরের একমাত্র অধিকারী !...

রুইদাস বলেন—ব্রাহ্মণ তবে আমিও !



রুইদাস জোড়হাতে বলেন—আপনারা আমার উপর শুধু শুধু রাগ করছেন।

[পৃ—২৯

—কী—কী বললি ? চামার হয়ে এত বড় কথা !

রুইদাস বলেন—আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব তো শুধু যজ্ঞোপবীতে ! সে-

যজ্ঞোপবীত আমার জন্মগত অধিকার। গত জন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম···ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতে আজও আমি ভূষিত! তবে আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম বলে বাইরের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করতে হয়েছে। আপনারা যদি আমার গায়ের চামড়া কেটে দেখতে চান, আমি দেখাতে পারি যে আমার সে যজ্ঞোপবীত আমার দেহে আজও বর্তমান!···

একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করেন—এর কোনো চিহ্ন তুই দেখাতে পারিস?

অপরজন বলেন—বেশ, গায়ের চামড়া কেটে বার কর তোর যজ্ঞোপবীত। হুঃ, উনি আবার পূর্বজন্মে ব্রহ্মচারী ছিলেন! কথায় বলে, পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী! আচ্ছা, প্রমাণ দেখা যে তোর গায়ের ভিতরে আজও রয়েছে তোর সেই যজ্ঞোপবীত।

রুইদাস বলেন—বেশ, আমি আমার চামড়া-কাটা বাটালি এনে আপনাদের হাতে দিচ্ছি। যদি সত্যই দেখতে চান, নিজ হাতে আমার গায়ের চামড়া কেটে দেখে নিন আমি সত্যি বলেছি না মিথ্যে বলেছি।···

পণ্ডিতদের মধ্যে ইশারা চলে—চামড়া কাটতে গেলে রুইদাস যা জখম হবে তাতে তার জীবন-সংশয় হতে পারে।···এই সম্ভাবনায় কেউ হন উৎফুল্ল, আবার কেউ পান ভয়।

চামড়া-কাটা বাটালি এনে রুইদাস পণ্ডিতদের হাতে তুলে দেন। একজন পণ্ডিত সেটি হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন—কোন্‌খান থেকে তোমার গায়ের চামড়ায় বাটালি চালাব বল হে?··· এইবার বেটা জ্বালার চোটে রামনামের ভেক ভুলবে!

রুইদাস আঙুল দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের পাশটা দেখিয়ে দেন। অমনি সেখানে বাটালির ঘা পড়ে।···ব্রাহ্মণ বাটালি চালিয়ে সত্যই কিছুটা চামড়া ছেদ করেছেন, এমন সময় সেখানে আসেন রুইদাসের গুরু রামানন্দ স্বামী।

রামানন্দ এসেই পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করেন—ব্যাপার কি?

পণ্ডিতেরা রামানন্দকে অবজ্ঞার স্বরে বলেন—যেমন শিষ্য, তার তেমনি গুরু!···আমরা রুইদাসের পূর্বজন্মের পইতা খুঁজে বার করছি। রুইদাস বলছে, তা দেহের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

রামানন্দ হেসে বলেন—রুইদাস এ প্রমাণ পাবে কোথায়? রুইদাস তো সামান্য চামার! তাছাড়া চামড়া কাটে যারা, তারা এজন্ম কেন পূর্বজন্মেও চামার বই কিছুই ছিল না! চামারের ধর্মাধিকার নেই··· আর যাঁরা এই চামড়া কাটার পরামর্শ দেন তাঁরাও অব্রাহ্মণ তো বটেই—চামারাধম!

সবাই সাধু সাধু বলে রামানন্দ স্বামীর জয়ধ্বনি করেন। বলেন—দেখ্ চামার রুইদাস, তুই যাঁকে গুরু বলিস, তিনি বলছেন—চর্ম যারা কর্তন করে তারা চামার ছাড়া কিছুই নয়, সে এজন্মেই হোক আর পূর্বজন্মেই হোক।···আর চামারদের যে ধর্মাধিকার নেই তাও নিজ কানে শুনলি। এখন বল্, এ-মন্দির ব্রাহ্মণদের হলো না চামারদের হবে?···

রুইদাস গুরুজীর ইঙ্গিত বুঝে নিলেন, তাই চুপ করে থাকেন।

রামানন্দ স্বামী বলেন—ব্রাহ্মণদের হবে।

সবাই বলে ওঠেন—ঠিক ঠিক।

রামানন্দ বলেন—আর ব্রাহ্মণ হয়েও যাঁরা চামড়া কাটার সহায়তা

করেন, তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব খুইয়ে বসে থাকেন; কাজেই তাঁরা এ-মন্দিরের অধিকারী নন। অর্থাৎ এ-মন্দিরের অধিকারী না রুইদাস আর না রুইদাসের স্বজাতি—এ শুধু ব্রাহ্মণদের !···

সবাই উত্তেজিত ভাবে রুইদাসকে মন্দির ত্যাগের আদেশ দেন।

রামানন্দ উত্তেজিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে শান্ত হতে বলে বলেন—আপনারা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করুন, কারণ আপনারা সবাই চামার—চামারের সহায়ক। রুইদাসের গায়ের চামড়া কেটে আপনারাও চামার হয়েছেন···আর যাঁরা কাটেন নি অথচ কাটতে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই চামারাধম !

পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত !···এর কি উত্তর—এর কি প্রতিকার !···

রামানন্দ স্বামী বলেন—এর প্রতিকার হচ্ছে, এ-মন্দির এখন থেকে আমার। আমি এ-মন্দির আমার প্রিয় শিষ্য বৈষ্ণব-প্রধান ভক্ত-প্রধান শ্রীরুইদাসকে দান করলাম।···

সবাই মাথা নীচু করে মন্দির ত্যাগ করতে বাধ্য হন।···

রুইদাস গুরুর চরণে প্রণাম জানান।

কাশীর পণ্ডিতেরা কিন্তু রামানন্দ স্বামীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা সদলে গিয়ে হাজির হলেন কাশীরাজের কাছে···নালিশ জানালেন রুইদাসের অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কার্যের জন্যে !···

মহারাজ রুইদাসের এই ধর্ম-বিরুদ্ধ আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান···সবার সামনে তাঁর বিচার-অপেক্ষায় তৈরী হয়ে থাকেন।···

রুইদাস রাজদরবারে উপস্থিত হলে রাজা রুইদাসের কাছে তাঁর এরকম ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজের জন্য কৈফিয়ত চাইলেন। রুইদাস ব্রাহ্মণদের যা যা বলেছিলেন, রাজার কাছেও সেই সব বললেন। কিন্তু রাজা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি রেগেমেগে বলে উঠলেন—ওরে শয়তান, কেন তুই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিস্ ? চামারের মন্দির-প্রতিষ্ঠা—হিন্দুধর্মকে বিনাশ করা ! ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এখনি তাঁদের হাতে মন্দির সমর্পণ কর্।···

ব্রাহ্মণেরা বলেন—ওই মন্দিরের পুনঃশুদ্ধি করে, নারায়ণ-শিলাকে গঙ্গা-স্নানাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।···

রুইদাস বিনয় করে বলেন—মহারাজ ! আপনি যদি মন্দিরে নিজে উপস্থিত থেকে ব্রাহ্মণেরা যা যা বলছেন তা করাতে পারেন, তাহলে আমি এখনি ব্রাহ্মণদের মন্দির আর নারায়ণ-শিলা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবো।

মহারাজ বুঝলেন, হয়তো ব্রাহ্মণেরা রুইদাসের এই মন্দির নিয়ে নিজেদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি করবেন। তাই নিজেই এ মন্দিরের ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকতে রাজী হন।···

মন্দির-প্রকোষ্ঠ চামার-ব্যবহৃত বলে গঙ্গাজলে তা ধোয়া হলো। সর্বশেষে নারায়ণ-শিলাকে বেদীপীঠ হতে ওঠাতে গিয়ে ঘটল মহাবিভ্রাট !···

বেদীপীঠের সিংহাসন থেকে নারায়ণ-শিলাকে এতটুকু কেউ নাড়াতে পারলেন না। সবাই মিলে কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু এতটুকু টললেন না নারায়ণ-শিলা !···

মহারাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, কিন্তু এ-রহস্য ভেদ করতে পারেন না।···

সবাই হতাশ হয়ে মহারাজকে নিবেদন করেন। মহারাজ বলেন—আচ্ছা, রুইদাসকে ডাকুন !

রুইদাস সামনেই ছিলেন। তিনি মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করেন। চামার-সংস্পর্শে অপবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণকে এতক্ষণ এঁরা ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে তুলেছিলেন, রুইদাসের আগমনে সে আবার অপবিত্র হয়ে ওঠে···

মহারাজ কিন্তু এতটুকু চঞ্চল হন নি। তিনি রুইদাসকে সম্বোধন করে বলেন—রুইদাস মহারাজ ! আপনি আপনার দেবতাকে কোলে তুলে নিতে পারেন কি ?

বিনা বাক্যব্যয়ে রুইদাস নিমেষে সেই নারায়ণ-শিলাকে তাঁর নিজের বুকে তুলে নিয়ে গেয়ে ওঠেন—

"মরম্ ক্যাইসে পাইওরে !
পণ্ডিত কৌন কহে সমুঝাই।
জাতে মেরো আওয়াগমন বিলাই ॥

বহু বিধি ধরম্ নিরুপিয়ে।
করতে দেখে সব কোই ॥
জেহি ধরমে ভ্রম ছুটি হ্যায়।
সেই ধরম ন চীহ্নে কোই ॥"

অর্থাৎ—আমার মরমের সত্য দিয়ে কারোরই মর্ম বুঝি না—পণ্ডিত যা বলেন তা বুঝি না। আমরা নীচু জাত, তাই বোধহয় বুঝি না। কতরকম ধর্মই নিরূপণ করছেন—কত রকম ধরম দেখাচ্ছেন—কিন্তু যে-ধর্মে ভ্রম ছুটে যায়, সে-ধর্ম কেউ চিনতে জানেন না।

রাজা চমকে ওঠেন—চমকে ওঠেন পণ্ডিতবর্গ! নিশ্চল নারায়ণ-শিলাকে অনায়াসে কি করে রুইদাস বুকে তুলে নিলেন—সেই সমস্যায় সবাই হতবাক্!···

মহারাজ বলেন—এ নারায়ণ-শিলা রুইদাসের ভক্তিতেই চিরবাঁধা। তাঁর প্রেম-আহ্বানে তাই তিনি সাড়া দিয়েছেন। যেখানে দেবতা সাড়া দেন, সেখানে সর্বধর্ম মাথা নীচু করে।···আজ থেকে শ্রীমন্দির আর শ্রীনারায়ণ-শিলা চামার রুইদাসেরই ভক্তিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক।··· হে পণ্ডিতগণ! আপনারা মহামূর্খ, তাই এহেন ভক্তকে চিনতে পারেন নি।···ভগবানের পূজায় চাই ভক্তি! তাঁর কাছে জাতের বড়াই নিষ্প্রয়োজন।···রুইদাস! আমি কাশীর রাজা হয়ে আপনার ভক্তি দেখে বিস্ময়ে শুধু অবাক্ হই নি, আজ থেকে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নিজেকে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনার পায়ে বিলিয়ে দিলাম।

রাজা রুইদাসের চরণে প্রণাম জানান। রুইদাস শ্রীরামজীর নামগানে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তোলেন।

৭

কাশীরাজের সমর্থনে, নিজের ভক্তির পরিচয়ে রুইদাস সারা বারাণসীতে সুনাম ছড়িয়েছেন। দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এলে কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনের মতো রুইদাসজীকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির আর নারায়ণ-শিলাকে দর্শন না করে কাশী ত্যাগ করতেন না।...

* * *

চিতোর থেকে এসেছেন ঝালোর রাজকন্যা কালী কাশীতে তীর্থযাত্রায়।...

শোনা যায়, ঝালোর-দুহিতা কালীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন চিতোরেশ্বর কুম্ভ। কালী কিন্তু ভালোবেসেছিলেন মন্দার-কুমারকে। ভক্তিমতী মীরাবাঈ কালীকে অবশেষে মিলিয়ে দিয়েছিলেন মন্দার-কুমারের সঙ্গে।...

ঝালোর-কন্যা কাশীতে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোক মুখে শুনলেন ভক্ত রুইদাসের অদ্ভুত কাহিনী। হোক—হোক সে চামার, তবু ভক্ত যে! তাঁর আবার জাতবিচার কি! ঝালোর-নন্দিনী দেখেছেন ভক্তিমতী মীরাবাঈকে। তাই তিনি প্রকৃত ভক্তকে দেখলেই চিনতে পারেন। ভক্তপ্রবর রুইদাসকে চিনতেও তাঁর বিলম্ব হলো না। তিনি তাই চললেন রুইদাস-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে দেবদর্শনে আর ভক্ত রুইদাস দর্শনে...

দেবমন্দিরে পদার্পণ করেই কালী তাঁর অন্তরে অনুভব করলেন এক অভূতপূর্ব পুলক-শিহরণ !···অদূরে নারায়ণ-শিলার সামনে বসে যোগী ভক্ত রুইদাস। সৌম্য কান্তি, মুখে অপূর্ব প্রশান্তি। দেখলেই মনে হয়, ওঁর চরণে মহারানীর সকল গর্ব নুয়ে পড়েছে।···কালী গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকান।···

রুইদাস তাঁর পানে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন—কি চাই মা ?

ঝালির রানী বলেন—অধীনা আপনার কাছে দীক্ষা-প্রার্থিনী।

রানীকে দীক্ষা দিতে গিয়ে রুইদাস তাঁর সামনে একটা গান গেয়েছিলেন মাত্র ; হয়তো সেই গানেই তাঁর দীক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল—

"প্রভুজী ! তুম্ চন্দন, হম্ পানী।
জাকী অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানী ॥"

—প্রভুজী ! তুমি যদি চন্দনকাষ্ঠ হও, আমি তবে জল—যার (চন্দনের) প্রতি অঙ্গের সুবাস একই রকম।

"প্রভুজী ! তুম্ ঘন বন, হম্ মোরা।
জেইসে চিতবৎ চন্দ-চকোরা ॥"

—প্রভুজী ! তুমি যদি ঘন বন হও, আমি তবে ময়ূর—যেমন চাঁদ আর চকোরের চিত্তে চিত্তে সম্বন্ধ থাকে।

"প্রভুজী ! তুম্ দীপক, হম্ বাতী।
জাকী জোতি বরে দিনরাতি ॥"

—প্রভুজী ! তুমি যদি দীপক অর্থাৎ সূর্য হও, আমি তবে রৌদ্র—যার (সূর্যের) জ্যোতিধারায় দিনরাত্রি হচ্ছে।

"প্রভুজী ! তুম্ মোতি, হম্ ধাগা ।
জেইসে সোনাহি মিলত সোহাগা ॥"

—প্রভুজী ! তুমি যদি মুক্তার দানা হও, আমি তবে সুতো— যেমন সোনাতে মেলে সোহাগা ।

"প্রভুজী ! তুম্ স্বামী, হম্ দাসা ।
এইসি ভক্তি করে রৈদাসা ॥"

—প্রভুজী ! তুমি আমার স্বামী, আর আমি তোমার দাস ।···এমন ভক্তিপথ শুধু রুইদাসই জানে ।

ঝালির রানী এর তাৎপর্য বুঝে রুইদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন··· দীক্ষা পেলেন—রামনাম ! বুঝলেন ভক্তিপথেই মুক্তি !

* * *

কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী সেদিন রানীর পাগলামি দেখে হেসে ওঠেন । সুদূর চিতোর থেকে কাশী এসে শেষ পর্যন্ত পাগল না হলে কেউ এক চামারকে গুরুপদে বরণ করে !······

কথাটা কানে গেল ঝালির রানীর । তিনি কারোকে কিছু না বলে মন্দির-চত্বরে সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করেন ।

সবাই ভাবেন—ঝালির রানী মন্ত্র নিয়েছেন, তারপর যখন ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে ডেকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই মোটারকম ব্রাহ্মণ-বিদায় করবেন—হয়তো সোনা-রূপাও পাওয়া যাবে !

সন্ধ্যায় মন্দির-চত্বরে ব্রাহ্মণদের ভিড় জমেছে । সবাই উপস্থিত,

কেবল রানী এখনও আসেন নি। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর অপেক্ষায় আছেন।...

কিছুক্ষণের মধ্যেই রানী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর দীক্ষাগুরু রুইদাসকে।

সবার চোখ কপালে ওঠে!

ঝালির রানী চত্বরের নীচের সিঁড়িতে ভক্ত রুইদাসকে বসার জন্য অনুরোধ করেন। ভক্ত রুইদাস হাসিমুখে সেখানে উপবেশন করেন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী রানীর কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে ভেবে জয়ধ্বনি তোলেন।...

রানী ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—এক চামারের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম মনের বিভ্রমে! তাঁর ভোজবাজিতে মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ দীক্ষা নিয়ে বসলাম। এর ফলে যে পাপ রচনা করলাম, সে পাপ ক্ষালনের উপায়ের জন্য আপনাদের আহ্বান জানিয়েছি। আর যিনি আমায় দীক্ষা দিয়ে আমায় এই মহাপাপে লিপ্ত করেছেন, তাঁকেও ধরে এনেছি—তিনিও কম পাপী নন—তাঁরও পাপের বিচার আপনাদের করতে হবে।...

পণ্ডিতেরা মহাখুশী...গুনগুন রব ওঠে! শাস্ত্রবিদ্‌রা মাথা নাড়েন।...

এমন সময় রানী বলেন—তবে!...

সবাই অবাক্ হয়ে ভাবেন—তবে?

ঝালির রানী বলেন—উনি আমায় যে ভোজবাজি দেখিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে এই যে উনি ওঁর ঠাকুরকে ডাকতেই তিনি বিগ্রহের মধ্য থেকে সজীব রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসে ওঁর কোলে চড়ে বসলেন! আমি এই দেখে ওঁকে এক মহাযোগী ভেবে মন্ত্র নিলাম।...আপনাদের মধ্যে

যে-কেউ এইভাবে আহ্বান করে যদি এ মন্দিরের ওই রাম-বিগ্রহকে প্রাণবন্ত করে কাছে আনতে পারেন, তিনিই পারবেন আমার এই পাপ ঘুচাতে এবং ওই চামার রুইদাসের বিচারের অধিকারী হতে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁর চরণে চিরজীবনের জন্য শির নত করে দেবো এবং আমার প্রভূত ধনরাশি এনে তাঁর পায়ে নিবেদন করবো !

ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিশ্চল—নির্বাক্ ! বেদজ্ঞ ছজন ব্রাহ্মণ বলেন—আমরা বৈদিক মন্ত্রে ওঁকে আহ্বান জানাবো—সামগানে !

* * *

বেদমন্ত্রের উচ্চারণে মন্দির-প্রাঙ্গণ রণিত-ধ্বনিত হতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বিগ্রহের দেহে প্রাণ-সঞ্চার হয় না···

বেদীপীঠে পাথরের দেবতা পাথর হয়ে থাকেন !

রানী তখন রুইদাসের কাছে জোড়হাতে নিবেদন করেন—মহারাজ ! আপ্ কুছ্ গীত শুনাইয়ে—আপনি কিছু নামগান শোনান।

বেদমন্ত্রের অন্তরালে রুইদাসের উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি গাইছেন—

“নরহরি ! চঞ্চল হায় মতি মেরি।
ক্যাসে ভগতি করু ম্যয় তেরী ॥”

—হে নরহরি ! আমার মতি অতি চঞ্চল, আমি তোমায় কি করে ভক্তি করব ?

“তু মোঁহি দেখে, হৌ তোঁহি দেখুঁ, প্রীতি পরস্পর হোই।
তু মোঁহি দেখে, তোঁহি ন দেখুঁ, ইয়ং মতি সব বুধি খোই ॥”

—তুমি আমায় দেখো, আমিও তোমায় দেখবো—পরস্পরের মধ্যে

এইভাবেই প্রীতি হবে।···তুমি যদি আমায় দেখ, আর আমি যদি তোমায় না দেখি, তা হলে আমার এই মনোভাবই আমার সব বুদ্ধি নষ্ট করে দেবে।

"সব ঘট অন্তর রমসি নিরন্তর, ম্যায় দেখন নহি জানা।
গুণ সব তোর, মোর সব অগুণ, কৃত উপকার ন মানা ॥"

—সমস্ত ঘটেই অর্থাৎ বস্তুতেই তুমি নিরন্তর রয়েছো, আমি তা দেখতে জানি না! সব গুণই তোমার, আমি নির্গুণ, তোমার কৃত উপকারটুকুও মানতে চাই না!

"ম্যায় ত্যয় তোরি মোরি অসমঝি,
সো ক্যাসে করি নিস্তারা।
কহ রৈদাস কৃষ্ণ করুণাময় জয় জয় জগত-আধারা!"

—আমি যে তোমারি আর তুমি যে আমারি—সেটাও বুঝি না। তবে কেমন করে নিস্তার পাবো! রুইদাস, শুধু তবে বল যে কৃষ্ণ করুণাময়···জয়! জয়!···তুমি জগতের আধার-স্বরূপ!

বেদীপীঠে দুলে ওঠে শ্রীরামজীর বিগ্রহ···চরণের পায়জনিয়া বেজে ওঠে! বেদীমূল হতে প্রাণবন্ত শিশু রাম ঠমকে ঠমকে এগিয়ে আসেন সবার সম্মুখে···পায়ের পায়জনিয়ার মধুর শব্দে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে স্মিত হেসে চড়ে বসেন রুইদাসের অঙ্কে।

রুইদাস শিশু রামকে কোলে তুলে নিয়ে বসিয়ে দেন তাঁর যথাযথ আসনে। জীবন্ত শিশুমূর্তি দেখতে দেখতে পাথর হয়ে যায়!···

ঝালির রানী এসে রুইদাসের পদতলে পড়ে জ্ঞান হারান। মুহুর্মুহুঃ 'রামনাম' উঠে মন্দির-প্রাঙ্গণ ভরে যায়···

ব্রাহ্মণমণ্ডলী রুইদাসের নিকট ক্ষমা চাইতে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু···
রুইদাস কোথায়! শ্রীমন্দিরে তো রুইদাস নেই!
একজন দৌড়ে চলেন রুইদাসের মুচির আড্ডায়···স্বচক্ষে দেখে



বেদীমূল হতে প্রাণবন্ত শিশু রাম এগিয়ে আসেন। পৃঃ ৪৩

আসেন, রুইদাস তাঁর নিজের জায়গাটিতে বসে জুতো সেলাই করছেন আর রামধুন গাইছেন।

৮

বারাণসীধামে রুইদাসের নাম এখন সর্বত্র। নাম শুনে বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে জড়ো হয় রুইদাসের কাছে রোগ-শোক-দুঃখ-তাপের জ্বালা নিয়ে। সবাইকে রুইদাস দেন একই মহৌষধ! সে হচ্ছে তাঁর রামনাম-গান আর রামজীর পূজান্তে চরণামৃত।...

রুইদাসের জুতোশালায় রামজীর চরণামৃত বড় একপাটি চামড়ার জুতোর মধ্যে ভরে রাখা হতো। যত পাপী, তাপী, রোগী, শোক-সন্তপ্ত লোক আসতো, এই চামড়ার আধার থেকে তৃপ্তির সঙ্গে চরণামৃত খেয়ে নিরাময় হতো এবং রুইদাসের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আনন্দ করে ঘরে ফিরতো।...

একদিন এক বণিক্ তার বন্ধুর সাথে রুইদাসের চামড়ার দোকানে এসে তাঁকে দর্শন করে। তখন দোকানের সকলকেই শ্রীরামজীর চরণামৃত বিতরণ করা হচ্ছিল। জুতোর মধ্য থেকে চরণামৃত ঢেলে সবাইকে দেওয়ার সাথে বণিকের ও তার বন্ধুর হাতেও তা দেওয়া হলো।

বণিকের বন্ধু সে চরণামৃত মুখে দিয়ে মাথায় মেখে নিল। কিন্তু বণিক্ জুতায় রক্ষিত চরণামৃত হাতে নিয়ে খাবার ভান করে মাথার উপর দিয়ে পেছনে ফেলে দিল—হাতটা গায়ে গালে বুলিয়ে নিল। তারপর সে ঘরে ফিরে এসে সারা অঙ্গ জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেললো।...

সাতদিন কাটে না। বণিকের গায়ে শ্বেতকুষ্ঠ দেখা দিল; অথচ বন্ধুর রং ও চেহারার যেন জলুস ফুটে বেরুতে লাগল! চরণামৃতের জল

বণিকের গায়ের যে-যে অংশে লেগেছিল—যা সে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করেছিল—সেই-সেই অংশে একপ্রকার ঘাও ফুটে বেরুলো এবং পনের দিনের মধ্যে তা গলিতকুষ্ঠে পরিণত হলো।

বৈদ্যরা দেখে বলেন এ কুষ্ঠ ভাল হবার নয়।

বণিক্ বন্ধুকে ডেকে রুইদাসের জুতোয় রাখা চরণামৃতের নিন্দে করে বলে—ওই সব খেয়েই আমার এই দশা হয়েছে!

বন্ধু বলে—আমি দেখেছি, তুমি চরণামৃত খাও নি, পিছু দিকে ফেলে দিয়েছিলে। যেখানে যেখানে চরণামৃতের এতটুকু জল লেগেছিল, তুমি তা সবই গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেলেছিলে। তবে আজ চরণামৃতের দোষ দিচ্ছ কেন! আমার মনে হয়, চরণামৃত অবজ্ঞা করার ফলেই তুমি আজ পীড়িত। চলো আমার সঙ্গে, মহারাজ রুইদাসের কাছে গিয়ে এই অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। তিনি ক্ষমা করলে তুমি নীরোগ হবে, একথা আমি নিশ্চয় করেই বলতে পারি।

বন্ধুর কথা শুনে বণিকের মনে মনে বড় ভয় হলো! সে বন্ধুকে লুকিয়ে একাই গিয়ে হাজির হয় রুইদাসের কুটীরে।···

সেদিনও সবাইকে চরণামৃত দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বণিক্‌কে সে চরণামৃতের অংশ দেওয়া হলো না। বিফলমনোরথ হয়ে বণিক্ ঘরে ফিরে এলো···

এমনি করে মাসাবধি প্রত্যহ সে রুইদাসের কুটীরে গিয়ে হত্যা দিতে লাগল। শেষে একদিন রুইদাসের পা জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি শুরু করল। রুইদাস তাঁর পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—তুমি যদি

অপরাধ করে থাকো, সে করেছো রামজীর কাছে ; কাজেই তাঁর পা জড়িয়ে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাও···তিনি ক্ষেমংকর !

বণিক্ মন্দিরে গিয়ে নারায়ণ-শিলার কাছে হত্যা দেয়। তিন দিন, তিন রাত্রি অহরহ কাঁদে আর ক্ষমা চায়।···

স্বপ্নাদেশ হলো—চামড়ার জুতায় রক্ষিত চরণামৃত নিজ হাতে তুলে খাও, সর্ব অঙ্গে প্রলেপ দাও, তুমি নিরাময় হবে !

বণিক্ রুইদাসের কুটীরে চামড়ার জুতায় রক্ষিত চরণামৃত নিজ হাতে মুখে ঢেলে দেয় এবং অঞ্জলি ভরে নিয়ে তা সর্ব-অঙ্গে মেখে নেয় ; তারপর সুস্থ হয়ে রুইদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ঘরে ফিরে যায়। মুখে তার—'জয় জয় রাম' !

রুইদাস চিতোর থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

ঝালির রানীর এ প্রাণের আহ্বান ; তাই রুইদাস এ আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না।...

কাশী থেকে পথ চলেছে...প্রয়াগ, বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে রাজপুতানার দিকে। জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ পথ, তার উপর পাহাড়-সংকুল। বন্ধুর পথে রুইদাসের একমাত্র সহায় রামজী।

* * *

সাত দিনের পথ অতিক্রম করে এসে গেছেন পুষ্করাভিমুখে। ঘন জঙ্গল...পাহাড়...বালুকাপূর্ণ পথ ! চলা আর যায় না ! তবু চলেছেন ভক্তের আহ্বানে।

তৃষ্ণার্ত হয়েছেন। সামনে গ্রাম। হয়তো জল পাবেন !

কুয়া থেকে জল তুলে মুখে দিতে যাবেন, পিছু থেকে স্ত্রী-কণ্ঠে কে যেন বলে ওঠেন—হে সন্ন্যাসি ! হে যোগি ! আমিও বড় তৃষ্ণার্ত, আমায় একটু জল দিন !

রুইদাস বলেন—কে তুমি মা ?

স্ত্রীলোকটি কাতরকণ্ঠে বলেন—আমার পরিচয় শুধু আমার গৈরিক বসন ! আমি আপনার গৈরিক বসন দেখে এইটুকু বুঝেছি যে আমরা সমগোত্রীয়—আমরা বিষ্ণুর পূজারী।

রুইদাস উত্তর করেন—আমি মা জাতিতে চামার। আমার হাতের জল কি আপনি খাবেন ?

স্ত্রীলোকটি রুইদাসের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন।...একি ! এ যে সেই পুরুষপ্রধান, যাঁকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—গুরু বলে প্রণতি

জানিয়েছেন ! সেই সৌম্য সহাস ধ্যানমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে··· নিজ মুখে বলছেন—আমি জাতিতে চামার !

স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট দেবমূর্তির দিকে। তারপর বলেন—প্রভু ! চর্মের ঢাকা মানুষের এই দেহমন্দির ! চামড়ার ঘেরাটোপের অন্তস্তলে বসে আছেন সবার প্রাণের ঠাকুর। চামড়ার শরীর নিয়ে তাই সবাই যে চামার !···আর তুমি দেব যদি চামার হও, তবে ত্রিভুবনে অ-চামার কে আছেন ? তুমি আমায় জল দাও, আমি বড় তৃষিতা !

জল ঢেলে দেন রুইদাস সেই স্ত্রীলোকের হাতে। নিজের পেয় জল নিজে পান না করে ঢেলে দেন আর বলেন—হে নারীশ্রেষ্ঠা ! তোমার হাতে পানীয় দিয়ে আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার পরমারাধ্যা সীতাদেবীর কর-কমলে জল ঢেলে দিচ্ছি !

রমণী জল পান করে জোড়হাতে নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলেন—হে পুরুষপ্রধান ! তোমায় আমি স্বপ্নে গুরুরূপে বরণ করেছি ···তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো !

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান নারী···

রুইদাস নিমেষে সে-স্থান পরিত্যাগ করেন। ভাবেন—আমার আরাধ্যা সীতাদেবী আজ আমারই পদতলে নত হয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন ···এ যে অসম্ভব···এ যে মহাপাপ !

নারী ভূতলে চক্ষু মুদে পড়েন থাকেন। প্রাণ ভরে নিজের দীনতা জানিয়ে ওঠে দাঁড়ান···

কিন্তু কই···যোগী কোথায় ! যোগী যে চলে যান···তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট

গুরু যে চলে যান !···ওই যাচ্ছেন—উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে দূরান্তের পথে পা ফেলেছেন···

নারী ধৈর্য-হারা হয়ে কাতরকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—

"যোগী ! মাত্‌জা—মাত্‌জা—মাত্‌জা—
পাও পড়ি ম্যায় তেরি-তেরি হ্যায় !"

—যোগী ! তুমি যেও না—যেও না ! আমি তোমার পায় পড়ছি।

"প্রেম ভগতি কো পৌড় হী ন্যায়রী, হমকুঁ গৈল বাতা জা।
অগর-চন্দনকী চিতা রচাউঁ, আপনে হাথ্‌ জলা জা ॥"

—প্রেম আর ভক্তির পথ প্রদর্শন করে গেলে, কিন্তু পথ চলার উপায় বলে দিয়ে গেলে না ! আমি অগুরু-চন্দন দিয়ে চুল্লী রচনা করেছি, তুমি আপন হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।

"জল বন ভই ভস্মকী চেরী, আপনে অঙ্গ লগা জা।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর, জোত্‌মে জোত্‌ মিলা জা ॥"

—আমি চোখের জলে ভস্ম গুলেছি, তুমি তোমার অঙ্গে লাগিয়ে যাও ! মীরার প্রভু গিরিধারীকে স্মরণ করে মীরা বলছে—এসো যোগী, জাতে জাত মিলিয়ে যাও ! (অর্থাৎ আমিও যে-পথের পথিক, তুমিও সেই পথের পথিক, কাজেই আমরা সমজাত যে ! সেই জাতেই জাত মিলিয়ে দাও।)

তাই শোনা যায়, রুইদাস মীরা বাঈয়ের গুরুর আসন অধিকার করেছিলেন।

মীরা বাঈ তখন চিতোর ছেড়ে বৃন্দাবন-পথের অভিযাত্রী। পথে তুই পথিকের এভাবে দর্শন মিলল···

চিতোরের কাছে ঝালোরে এসে পৌঁছেছেন রুইদাস।

ঝালির রানী তাঁকে সম্মানিত করেছেন রাজগুরুর আসন দিয়ে। রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিতের মনে জেগেছে ঈর্ষা, দ্বেষ, বিদ্রোহ!

রাজগুরু সম্মানার্থে রানী তাঁর রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ জানান একটি ভোজে।

ইতিমধ্যে কানে কানে খবর এসে গিয়েছে যে রুইদাস জাতিতে চামার!…

রানীর এই ঘৃণিত গুরুবরণ দেখে রাজ্যের পণ্ডিতেরা সবাই ঘৃণায় মুখ ফেরালেন। অথচ রাজ-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবার মতো সাহস কারো নেই।…

পণ্ডিতমণ্ডলীর নিভৃত সভা বসে। বহু বিচার-বিবেচনার পর তাঁরা রানীকে জানান যে, এ নিমন্ত্রণ তাঁরা সাদরে গ্রহণ করে রানীকে সম্মানিত করবেন, যদি রানী তাঁদের স্বপাক-ভোজনের আদেশ দেন!…হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী তাঁরা নিজেদের রন্ধন নিজেরাই করে পরিতৃপ্ত আহারে রানীর এ নিমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করবেন। অবশ্য এ নিমন্ত্রিতের আসরে নীচ, অস্পৃশ্য, অছুতের কোনোই প্রবেশাধিকার থাকতে পারবে না।…

ঝালির রানী এ ইঙ্গিতের অর্থ বোঝেন। রুইদাসজীর জাত নিয়ে মুখে কেউ প্রতিবাদ না করলেও এ প্রস্তাব যে প্রতিবাদেরই অনুরূপ, তা রানী সহজেই বুঝতে পারেন। তিনি তাঁর গুরুজীর কাছে অকপটে সব কথা ব্যক্ত করলেন। রুইদাস হেসে উত্তর করেন—আপ্‌ রুচি খানা,

পর্ রুচি পহ্ না—নিজের রুচি অনুযায়ী আহার করা এবং পরের রুচি অনুযায়ী বসনভূষণ পরিধান করা বিধেয়।…

কাজে কাজেই রানী ঝালি তাঁর পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে পণ্ডিতদের এ-প্রস্তাব সমর্থন করলেন—মনে মনে খালি শরণ নিলেন স্বীয় গুরুদেবের। …গুরুদেব যদি অপমানিত হন, ভক্ত শিষ্যাও অপমানিতা হবেন; শিষ্যার অবমাননা যদি হয়, সে অবমাননা গুরুরও। এই ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন…মনে শান্তি পেলেন।

রাজগুরুর অভিষেকে সবাই উপস্থিত হলেন। এলেন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের দল। রাজ-রন্ধনশালায় তাঁরা উপস্থিত হয়ে রাজকোষ থেকে আটা আনাজ মসলাদি সিধা নিয়ে নিজেরাই রন্ধন করলেন। রাজ-মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করলেন…

ব্রাহ্মণেরাই আসন পাতলেন, ভোজন-পাত্রাদি সাজিয়ে নিলেন এবং শেষে নিজেরাই নিজেদের পরিবেশন শুরু করে দিলেন।

রুইদাস বসে থাকেন ঝালোর-বাগিচার কোণে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায়।

ব্রাহ্মণগণ যখন একসঙ্গে আচমনাদি করে ভোজনে বসেছেন, তখন শোনা যায় দূর থেকে ভেসে আসা এক সংগীত-লহরী!…

রানীও উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ভোজনস্থানে। তিনি কান পেতে শোনেন এ মধুর কণ্ঠ। ভাবেন—এ কণ্ঠ তো আর কারো নয়—এ যে স্বয়ং রুইদাসের কণ্ঠ! তবে কি গুরুজী ব্রাহ্মণদের আহার-স্থানে

এসে গিয়েছেন ?—না-না, তিনি তো নিজে তাঁকে তাঁর উদ্যান-বাটিকার কোণে নিরালা বটবৃক্ষের তলায় ধ্যানস্থ দেখে এসেছেন। তবে—!

কণ্ঠস্বর যেন দূর হতে আসে নিকটে···আরও নিকটে···ভাষা তার স্পষ্ট শোনা যায়—

"জব্ রাম নাম কহি গাবেগা ।
তব্ ভেদ অভেদ সমাবেগা ॥"

—যখন রামনাম উচ্চারণ করবে, তখনই ভেদাভেদ ঘুচে যাবে।

"জে সুখ হ্যায় ইয়া রসকে পয়সে,
সো সুখ কা কহি গাবেগাঁ ?"

—এই রামনাম রসের সুখ যে পেয়েছে, সে কি সে-সুখ কারো কাছে গেয়ে শোনাতে পারে ?

"গুরুপরসাদ ভই অনুমৌ মতি
বিষ অমৃতসম ধাবে গা।
কহ রৈদাস মেঠি জাপা পর,
তব ওয়া ঠৌরহি পাবে গা ।"

—গুরুপ্রসাদ পেয়ে মতি স্থির হলে তখন বিষও অমৃত হয়ে পিছু ধাওয়া করে। রুইদাস বলে—এ ভেদ মিটলেই মানুষ ভগবানকে পাবে।···

সংগীতের সুর যেন আহারব্যাপৃত ব্রাহ্মণদের প্রতিজনার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায় ! কী এক স্বর্গীয় সুরে যেন সবাইকে ঘিরে ফেলে !··· সবাই ত্রস্ত হয়ে নিজের নিজের চারপাশে চেয়ে দেখে। পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে সবাই হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

প্রত্যেকেই দেখে, তার পাশটিতে বসে রুইদাস তার সঙ্গে একপাতে আহার করছেন আর দোঁহাপদ গাইছেন।...

যত ব্রাহ্মণ, ততই রুইদাস! রানী চেয়ে থাকেন পণ্ডিত-মণ্ডলীর দিকে।...এ যেন কৃষ্ণের রাসলীলা...এক একজন গোপীর পাশে এক একজন কৃষ্ণ! আজ ঝালোরের মন্দির-চত্বরে ব্রাহ্মণদের ভোজনাসনের পাশে ঠিক তেমনি সবাই দেখেন প্রত্যেকের পাশে রুইদাস বসে আছেন। সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি তোলেন—

"জয় মহারানী ঝালির শ্রীগুরু রুইদাসজীকি জয়—জয় ব্রাহ্মণ রুইদাসজীকি জয়—জয় দেব রুইদাসজীকি জয়!"

রুইদাস কিন্তু উদ্যানের বটবৃক্ষের তলায় তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন।...

রানী এসে তাঁর পায়ে প্রণাম জানান।

এর অনতিকাল পরেই সারা চিতোরের লোক রুইদাসজীকে দেখবে বলে ভেঙে পড়ে।...

আর রুইদাসের থাকা হয় না। রানী বহু ধনদৌলত রুইদাসের পায়ে দিয়ে রুইদাসকে কাশী পাঠাতে চাইলেন; কিন্তু রুইদাস কিছুই ছুঁলেন না—কিছুই নিলেন না!...

গুরুদক্ষিণাস্বরূপ মাত্র দুটো সুপারি রানীর হাত থেকে গ্রহণ করে রুইদাস কাশী যাত্রা করেন।...

রুইদাস কাশীতে ফিরে এসেছেন। লোককে ঐশ্বর্য দেখিয়ে বেড়ানো তাঁর কাজ নয়—ভেবেছেন কতবার! কিন্তু তাঁর প্রেমের ঠাকুর দয়াল শ্রীরামচন্দ্র ভক্তের মান বজায় রাখতে বারবার তাঁর ষড়ৈশ্বর্য দেখিয়ে জনসাধারণের কাছে তাঁর ভক্ত রুইদাসের মান বাড়িয়েছেন।…এ দোষ রুইদাসের নয়—এ দোষ তাঁর, যিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য দেখিয়ে জনগণকে মুগ্ধ করেছেন।…

রুইদাস এ নিয়ে মাঝে মাঝে মনে দুঃখও পেয়েছেন—পাছে লোকে তাঁকে বাজিকর ভেলকিবাজ মনে করে! আবার ভাবেন—ভগবান দয়ালু, তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়ে ভক্তের মান বজায়ের ছলে বার বার সকলকে বুঝিয়ে বলেন—ওরে অবিশ্বাসীর দল, আমি আছি—আছি—আছি!

ভক্ত আর ভগবান্…দুজনে পরস্পর ভিন্ন হলেও মূলতঃ তাঁরা একই। ভক্তের দেহমনে ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন অপর কিছুই জানেন না…ভগবান্ও চিরদিন ভক্তের দাস হয়ে থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত…সেই কুসুমের দলে দলে প্রকটিত হয়ে ওঠে ভগবানের বিচিত্র লীলা।…

রুইদাসের বিপক্ষদল সমালোচনা করেন—ওসব বিভূতি-যোগের খেলা…বড় নিম্নশ্রেণীর যোগীর কাজ ওসব। তারা শুধু ভেলকি দেখিয়ে ভেক নিয়ে বেড়ায়।

রুইদাস ভেক নেন না। কেউ জোর করে দিয়ে গেলে তিনি তা গরিবদের বিলিয়ে দেন···কখনো বা গঙ্গার জলে তা নিক্ষেপ করেন।

ঝালির রানীর সুপারি ছুটো গঙ্গাজলে ফেলে দেবেন ভেবেও রুইদাস তা পারেন নি, অথচ কাছে রেখেও তিনি সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। কারোর কোনো দানই তিনি জীবনে নেন নি—গুমোর করে নয়—দাতার মনে আঘাত দেবেন বলে নয়···তাঁর ধারণা ছিল, দাতা জগতে একজন মাত্র, যাঁর দান করার পূর্ণ অধিকার আছে—তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্···তাঁর নিজের সম্পত্তি তিনি নিজে হাতে দান করেন। বাকী সব দাতা তো ভগবানের সম্পত্তি থেকে নিয়ে দান করেন—যাকে বলে পরের ধনে পোদ্দারি। রুইদাস তাই দান গ্রহণ করেন একমাত্র কর্তা-দাতার কাছ থেকেই, অপরের দানে তাঁর স্পৃহা নেই।···

গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রুইদাস ফল গ্রহণ করেছিলেন মহারানী ঝালির সুফল কামনায়। ফল মানে ছুটি সুপারি। ছুহাতে ছুটি নিয়ে এসেছেন··· দেবেন ওই গঙ্গাগর্ভে। মা ভাগীরথী তা গ্রহণ করে যা আশীর্বাদ দেবেন, তা তিনি বহন করে পৌঁছে দেবেন তাঁর প্রিয় শিষ্যার কাছে—এই তো গুরুর কাজ! ভাবেন—সামনে মকর-সংক্রান্তির যোগ···এই যোগেই এক ফাঁকে ফেলে আসবেন সুপারি ছুটো ওই গঙ্গার গর্ভে···

মকর-সংক্রান্তির দিনে বড় ভিড় জমেছে রুইদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে। দলে দলে ভক্তেরা সব এসেছেন দূর দেশ থেকে। উত্তর সীমানার সাধুরা সব নেমেছেন কাশীধামে মকর-সংক্রান্তির স্নানকামনায়।

তাঁরাও আশ্রয় নিয়েছেন রুইদাসের ধর্মশালায়। রুইদাস তাঁদের সেবা আর আপ্যায়নে ব্যস্ত···গঙ্গা দর্শনের সময় পাচ্ছেন না।

কাশীর পণ্ডিতেরা সব ভিড় করে দল বেঁধে চলেছেন গঙ্গা-স্নানে। রুইদাস তাঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে বলেন—পণ্ডিত মশাইগো, আপনারা গঙ্গায় যাচ্ছেন, আমার এই সুপারি দুটো মা গঙ্গার গর্ভে দিয়ে দেবেন···পরিবর্তে মা গঙ্গা যা দেবেন, তা এনে আমায় দয়া করে দিয়ে যাবেন?

পণ্ডিত বলেন—সুপারি দুটো না হয় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপই করলাম ···তাতে তোমার গঙ্গাদেবী আমার হাতে তুলে কিছু দেবেন? এ সব অসম্ভব কথা কি তুমি বলছো হে? বলি প্রকৃতিস্থ আছ তো?

রুইদাস বিনয় জানিয়ে বলেন—প্রকৃতিস্থই আছি। প্রকৃতিস্থ বলেই প্রকৃতি-মা চেনা দিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই আশীর্বাদ পাঠিয়ে দেবেন···আপনি ভয় পাবেন না।

চলেন পণ্ডিতেরা সব পথ ধরে। রুইদাসকে নিয়ে তাঁদের চর্চা চলে। হাসাহাসি, ঠাট্টা, মস্করা, হিংসা সবই ক্রমে প্রকাশ পায় রুইদাসের বিপক্ষে।

সবাই স্নানান্তে গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে মা গঙ্গাকে অর্ঘ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তীরে উঠে দাঁড়ান···রুইদাসের সুপারির কথা সবাই ভুলে যান।

ফিরে চলার আয়োজন হতে এক পণ্ডিত বলেন—ওহে! সেই রুইদাসের সুপারিজোড়াটা···গঙ্গায় ফেললে না?···

ফিরে দাঁড়ান পণ্ডিতমণ্ডলী।

যাঁর কাছে সুপারি ছিল, তিনি বলেন—বটেই তো! ভুল হয়েছিল

আর কি ! ভেবেছিলাম পূজাস্নান সেরে যাবার সময় ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেলকি দেখে বাড়ি ফিরে যাব।···ভাগ্যিস মনে করলে হে !

ছুড়ে ফেলে দেন সুপারিজোড়া গঙ্গার গর্ভে। সারা ঘাটব্যাপী জনসমারোহের মাঝে সবাই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।···গঙ্গাবক্ষে এ কি ! এ যে স্বয়ং মকরবাহিনী গঙ্গা মা ! হাতে একজোড়া সুবর্ণ কঙ্কণ নিয়ে তীরের দিকে ছুটে আসছেন ।

শঙ্খ ঘণ্টা জয়ধ্বনিতে ভরে যায় সারা আকাশ বাতাস। আজ ধন্য হয়েছে গঙ্গার স্নানার্থীরা, ধন্য দর্শকমণ্ডলী···ধন্য সাধু, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ !

কার কল্যাণে, কার তপে, কার কঠোর সাধনায়, কার ঐকান্তিক ভক্তিতে মকরারূঢ়া মা গঙ্গা ছুটে এসেছেন তীরের দিকে—তা দেখতে সবাই আগ্রহে অপেক্ষা করছেন···

দেখা গেল, মায়ের হাতে রক্ষিত সেই সুবর্ণ কঙ্কণ জোড়া একটি পণ্ডিতের হাতে তুলে দিয়ে মা অদৃশ্য হলেন ।

সবাই পণ্ডিতকে দেখতে ভিড় জমায়।···কে এই ভাগ্যবান্, কে এই মহাপুণ্যবান্—যাঁর হাতে মা গঙ্গা স্বয়ং খুলে দেন সুবর্ণ কঙ্কণ !

পণ্ডিত কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে চান ভিড় থেকে।···এ কঙ্কণ তিনি আর দেবেন না রুইদাসের হাতে। এ যদি এসেছে মায়ের হাত থেকে তাঁরই হাতে, তবে এ সুবর্ণ কঙ্কণ কেমন করে তিনি ছেড়ে দেবেন !···সবার অলক্ষ্যে তাই তিনি ছুটেছেন প্রাণপণে। পিছনের জনতা বলে ওঠে—ওই যায়···ওই যায় ! কিন্তু গলিপথ দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান নিমেষে।

নিরালায় এসে দাঁড়ান একান্তে। নিজের কাপড় থেকে খুলে সুবর্ণ বলয়টিকে ধীরে ধীরে দেখেন···



পণ্ডিত কিন্তু উধ্বর্শ্বাসে ছুটে পালাতে চান [পৃঃ ৫৭

পিছু হতে শব্দ আসে—পণ্ডিতজী, মা যা দিয়েছেন আমায় ফিরিয়ে দিন! ও আশীর্বাদী বস্তু আমার নয়—পরের গচ্ছিত ধন।

চমকে ওঠেন পণ্ডিত। পিছন ফিরে দেখেন রুইদাস দাঁড়িয়ে।··· এত দূরে রুইদাস কি করে এলো !

চট্ করে পাশ কাটিয়ে দৌড় দেন চতুর ব্রাহ্মণ।

এক শস্যপূর্ণ মাঠে ঢুকে পড়েন। মাথা সমান মকাই গাছ উঠেছে ···তারই আড়ালে নিজেকে ঢেকে ফেলেন।

পেছু থেকে শব্দ আসে—ব্রাহ্মণ, কেন মিছে অপরের গচ্ছিত ধন এমন করে কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছেন? আমায় ফিরিয়ে দিন মা গঙ্গা যা দিয়েছেন !···

পিছুতে দাঁড়িয়ে রুইদাস।

হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে আবার ছোটেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আর এগুতে পারেন না···চারদিক্ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুইদাস !

ব্রাহ্মণ তখন উপায়ান্তর না দেখে একগাছি স্বর্ণকঙ্কণ বার করে রুইদাসের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এই নাও তোমার পিতলের কঙ্কণ। বাবা—এর জন্যে এত দৌড়াদৌড়ি ! মা হাতে করে দিয়েছিলেন বলে আমার লোভ হয়েছিল যে এটা বাড়িতে গিন্নীকে দেবো···তা আর সহ্য হলো না···কেবল দাও—দাও—দাও···এই নাও !

রুইদাস একগাছি কঙ্কণ হাতে নিয়ে বলেন—পণ্ডিত-মশাই, মা কখনো একগাছি কঙ্কণ কারোকে দিতে পারেন না। এর জোড়াটিও আমায় ফিরিয়ে দিন···

পণ্ডিত জিব কেটে বলেন—মানে ! ঈশ্বরের দিব্যি, যা পেয়েছি সব তোমার হাতে তুলে দিয়েছি···আমি শপথ করে বলছি।

রুইদাস বলেন—বেশ, চলুন মা গঙ্গাদেবীর কাছে···তিনি নিজে এসে সাক্ষ্য দেবেন।

ব্রাহ্মণ নিমেষে ভেবে নেন, হ্যাঁ, গঙ্গাদেবীর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বার বার এসে ভেলকি দেখাবেন! বলেন—চলো হে, আমায় বেইজ্জতি করতে চাও···চল! তবে একগাছাই তিনি দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়েছেন। যা ভিড় জমেছিল···মা তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। হয়তো তাই একগাছা কঙ্কণ তাঁরই কাছে রয়ে গেছে।

গঙ্গার উপকূল লোকে লোকারণ্য।

রুইদাস উদাত্ত সুরে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান জানান, এবং মা গঙ্গার আরত্রিক শুরু করেন—

সন্ত্ উতারেঁ আরতী দেবি! সিরো মনিয়ে।
উর্ অন্তর তহাঁ বৈসে যিন্ রসনা ভনিয়ে॥
মনসা মন্দির মহিঁ ধুপ ধুপ হোয়ে।
প্রেম প্রীতি কী মাল রাম চড়ইয়ে॥
চহুঁ দিসি দিয়না বারি জগমগ রহিয়ে।
জোতি জোতি সম জোতি হিল্‌মিল্ হো রহিয়ে॥
তন মন আতম বারি তঁহা হরি গাইয়ে রী।
ভনত জন রৈদাস তুম সরনা আইয়ে রী॥

গঙ্গার চারধার জ্যোতিতে জ্যোতিতে নীলাভ বর্ণ ধারণ করেছে। আকাশের গায়ের রঙে ভরে গেছে মেদুর কজ্জলবর্ণ।—ভোরের আলোকের মতো উজ্জ্বল, অথচ চোখে পীড়া দেয় না···এমন জ্যোতি!

দেখা যায় মকরবাহিনী মা গঙ্গার আবির্ভাব! শত শত উৎসুক দর্শকের সামনে মা এসে দাঁড়ান। মানবীর কণ্ঠস্বরে রুইদাসকে আহ্বান জানিয়ে বলেন—কঙ্কণের অপরখানিও ওই ব্রাহ্মণের কাছে আছে··· ব্রাহ্মণ তোমায় দিয়ে দেবেন। ওই ব্রাহ্মণকে তুমি ক্ষমা করো রুইদাস! কারণ তুমিই তো ওঁকে আমার প্রদত্ত কঙ্কণ গ্রহণ করবার যোগ্য করে পাঠিয়েছিলে!

মিলিয়ে যায় সে অপূর্ব দেবীপ্রতিমা। উপরের সূর্য প্রখর হয়ে ওঠে। কোলাহলে মুখর হয় জনমণ্ডলী।

ব্রাহ্মণ তাঁর কাপড়ের ভিতর থেকে কঙ্কণের আর একটি বার করে রুইদাসের হাতে তুলে দেন···তারপর রুইদাসের পা জড়িয়ে কেঁদে ওঠেন।

রুইদাস বলেন—মা তোমায় ক্ষমা করে গেছেন···তোমার ভয় কি পণ্ডিত! এ কঙ্কণ মহারানী ঝালির। মা আশীর্বাদী-স্বরূপ তাঁকেই দিয়ে গেছেন! তুমি স্বয়ং হাতে করে তাঁকে এ স্থবর্ণ কঙ্কণ পৌঁছে দাও···তিনি তোমায় প্রচুর অর্থ দান করবেন।

সেই পণ্ডিতকে দিয়েই রুইদাস কঙ্কণজোড়াটি মহারানী ঝালির কাছে পাঠিয়ে দেন।

শোনা যায়, মহারানী প্রচুর দান দিয়ে ব্রাহ্মণকে বিদায় করেছিলেন! ব্রাহ্মণের আর কোনোদিনই দুঃখকষ্ট পেতে হয় নি।

রুইদাস ক্রমে জনবহুল সংসার থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। তাঁর দেহাবসানেও কবীরের মতো, তাঁর দেহের কেউ কোনো খোঁজ পান নি।···

শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও রুইদাসের বহু ভক্ত রয়েছে। শিখ ধর্মগ্রন্থে রুইদাসের লিখিত বহু ভজন প্রচলিত আছে। শিখগ্রন্থে 'রবিদাস সম্প্রদায়' নামে এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রুইদাস ভারত থেকে জাতি ও বর্ণের বৈষম্য ঘুচিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন! তাঁর ধর্মের মর্ম ছিল—

জাতি পাঁতি পুছে নহিঁ কোই।
হরিকো ভজে সো হরিকো হোই॥

রুইদাস একশ কুড়ি বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তারপর ব্রহ্মপদে লীন হয়ে যান।

গুজরাটপ্রান্তে রুইদাস সম্প্রদায়ের বহু লোক রয়েছেন। এ ছাড়া সারা উত্তর ভারতের বহু লোকই নিজেদের 'রবিদাসা' নামে পরিচিত করেন।

পরিশিষ্ট

রুইদাসী বা রয়দাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা—রুইদাস।… কেউ বলেন রয়দাস, কেউ বা আবার বলেন—রবিদাস।

ভক্তমাল-গ্রন্থকার শ্রীমৎ নাভাদাসজী তাঁর গ্রন্থে রুইদাসের স্থান নির্দেশ করেছেন মহাপুরুষদের মধ্যে।…

রুইদাস সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই পরম বৈষ্ণব, বহুশিষ্য-পূজিত রামানন্দদেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। কারণ রুইদাস রামানন্দের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান শিষ্য। রামানন্দের অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনন্তানন্দ, কবীর, রুইদাস ইত্যাদি প্রধান। রামানন্দদেব আবার রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রামাৎ উত্তর উত্তর ভারতের এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়। রামানন্দ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে অনেকে এঁকে রামানন্দীও বলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করেন।

রামানন্দদেব আবার রামানুজের শিষ্য বলে প্রচারিত। কিন্তু রামানুজ স্বামী খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন আর রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর জীবনলীলা সংবরণ করেন। কাজেই ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবর্তী হয়ে রামানুজের শিষ্যপরম্পরায় রামানন্দকে চতুর্থ পুরুষ বলে স্বীকার করা যায়।

রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, তাঁর শিষ্য রাঘবানন্দ এবং রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ।

শোনা যায় যে রামানন্দ কিছুকাল তীর্থপর্যটন করে স্বীয় সম্প্রদায়ের মঠে ফিরে এলে তাঁর সতীর্থগণ বলেন—ভোজন ও ভোজনক্রিয়া সংগোপনে করাই হচ্ছে রামানুজপন্থীর কর্তব্য। তীর্থপর্যটন সময়ে এ

নিয়ম কি তিনি পালন করেছিলেন ?···রামানন্দ অকপটে স্বীকার করেন যে তিনি সে-নিয়ম রাখতে সব সময় পারেন নি। ফলে তাঁর সতীর্থগণ তাঁকে আলাদা ভোজন করতে বলেন। শিষ্যবর্গের কথায় সায় দিয়ে এ কথা রামানন্দের গুরুজী রাঘবানন্দও সমর্থন করেন। তাতে রামানন্দ নিজেকে অপমানিত বোধ করে মঠ ত্যাগ করেন এবং নিজে নূতন করে এক মঠ রচনা করে পূর্বতন মত ও সংস্কার বজায় রেখে স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। তারপর তিনি বারাণসী-ধামে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে নিজের আশ্রম খোলেন।···

কালে, সে আশ্রম মুসলমানেরা ধ্বংস করে দেয়।···ওই ভগ্নস্তূপের মাঝে পাথরের তৈরী একটা বেদী আজও দেখা যায়—যার ওপর রামানন্দের পায়ের ছাপ রয়েছে। এছাড়া কাশীতে এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি মঠ আছে। সেই মঠস্থ পঞ্চায়েতের নির্দেশ অনুসারে সারা হিন্দুস্থানে রামাতেরা কাজ করে চলেন।

কাশীর মঠে রামানন্দের বহু ভারতবিদিত শিষ্য মন্ত্রদীক্ষিত হন, এবং পরে এঁরা এক একজন প্রসিদ্ধ সাধু হয়ে আজও সারা ভারতে প্রখ্যাত।···এঁরা হচ্ছেন—

অনন্তানন্দ, কবীর, সুখা, সুর, পদ্মাবতী, মহিমা, বিজয়া, নরহরি, পীপা, ভাবানন্দ, রুইদাস, ধনা, যোগানন্দ, গয়েস, করমচাঁদ, অহল পয়হারী, সারী রামদাস, শ্রীরঙ্গ ও গুণাকর। প্রথম প্রথম রামানন্দ জাতিভেদ মানতেন···পরে তিনি তা বর্জন করেন। এই ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রুইদাসের জীবন।

সমাপ্ত

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

১। মহাভারতীয় গল্প
২। পুরাণের গল্প
৩। পল্লীগীতি কাব্য-কথা
৪। জাতকের গল্প
৫। উপনিষদের গল্প
৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত নারী
৮। মঙ্গলকাব্যের কথা
৯। জ্ঞানে ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী
১১। রামায়ণী কথা
১২। ধর্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী
১৪। দেবী যুদ্ধের কাহিনী
১৫। ভক্ত-জীবন কাহিনী
১৬। মহাকবি বাল্মীকি
১৭। কালিদাস কাহিনী
১৮। বাইবেলের গল্প
১৯। কালিদাসের গল্প
২০। কুমারসম্ভব
২১। পৌরাণিক কাহিনী
২২। সেকালের রাজাদের গল্প
২৩। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প
২৪। বত্রিশ পুতুলের গল্প
২৫। কল্কিপুরাণের গল্প
২৬। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। কথাসরিৎ সাগরের গল্প
২৯। এঁদের ভুলো না
৩০। রূপ-সনাতন
৩১। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর
৩২। সন্ত তুলসীদাস
৩৩। ভক্ত রুইদাস
৩৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গল্প
৩৫। সাধু তুকারাম
৩৬। তৈলঙ্গ স্বামী
৩৭। লোকসাহিত্যের গল্প
৩৮। সাধক জীবন-কাহিনী
৩৯। ঠাকুর হরিদাস
৪০। রঘুবংশ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড